অমৃত মন্থন

অজিত মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—মহালয়া, ১৩৬৬

প্রকাশক—
এস, এন, মুখার্জ্জী
৫বি, মুখার্জ্জীপাড়া লেন,
কলিকাতা ২৬

মুদ্রাকর—
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী—
বিজন চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
রয়্যাল হাফ্‌টোন কোং

বাঁধাই—
আর্যলক্ষ্মী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

মূল্য চার টাকা

দেবতাকে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি—
তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেছি; তাঁকে
দেখ্‌তে পেয়েছি আমার জনক-জননীর
মাঝে—তাঁরাই আমার সাকার দেবতা।
সেই দেব-যুগল শ্রীচরণে আমার ভক্তি
অর্ঘ্য 'অমৃত মন্থন' অর্পণ করলাম।

অজিত

ভূমিকা

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের এই 'অমৃত মন্থন' বইটি পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, আশা আছে, প্রত্যেক বিচারশীল পাঠকই তা পাবেন।

ভাগীরথী তীরবর্তী সুতাহুটি গোবিন্দপুর ও কালিঘাটা এই তিনটি গ্রাম নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্ণক পত্তন করেছিলেন এক মহানগরীর এবং ইংরেজী রসনায় বিকৃত হয়ে এই কালিঘাটাই হয়েছিল ক্যালকাটা, যার বর্তমান বাংলা রূপ কলকাতা। কাজেই কলকাতার আদি মৃত্তিকাই হল কালিঘাটা বা কালিকাক্ষেত্র।

কিন্তু কলকাতার মতো অর্বাচীন নয কালিঘাটের ইতিহাস। অন্যূন হাজার বছর ধরে বাঙালী যাঁর পূজা করেছেন,

আবির্নিদাঘ জলশীকরশোভিত বক্ত্রাং
গুঞ্জা ফলেন পরিকল্পিত হার যষ্টিম্।
পত্রাংশুকমসিত কান্তিমনঙ্গতন্ত্রামাদ্যাং
পুলিন্দতরুণীং সকৃৎ স্মরামি ॥

সেই কালিকা ও তাঁর পূজাপীঠ এই কালিঘাটা অনেক কালের পুরানো। সেই জন্যেই আছে তার ইতিহাস।

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় সেই ইতিহাসই বিবৃত করেছেন এই বইয়ে এবং তাঁর ভাষা যেমন সরস সুন্দর, বলার ভঙ্গী তেমনি হৃদ্য। তাই প্রত্ন-তাত্ত্বিক ইতিহাস না হয়ে বইটি হয়েছে উপভোগ্য সাহিত্য, যা এই শ্রেণীর বই সচরাচর হয় না।

বাঙালীর আদি ইতিবৃত্ত যাই হক, বাঙালী যে শিব-শক্তি উপাসক প্রাগার্য জাতি-গোষ্ঠীর সন্ততি এবং রুদ্র ও কালিকাই যে তার মুখ্য দেবদেবী, আর আগম ও নিগমই যে তার মূল শাস্ত্রগ্রন্থ, এ নিয়ে বোধহয় আজ আর সংশয় নেই। সেই বাঙালী ঐতিহ্যের উৎসটি উন্মুক্ত করেছেন লেখক এই বইয়ে। তাঁর প্রয়াস সাধু।

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁর শিক্ষক। তাই আন্তরিক শুভাশীষের সঙ্গেই তাঁকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি বঙ্গ সাহিত্যের পূজামন্দিরে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১. ৪. ৫৯

মুখবন্ধ

অমৃত মন্থনের ক্ষেত্র কালীঘাট—কিন্তু তার তরঙ্গ অগ্রসর হয়েছে বহুদূর। নিকট ও দূরে মন্থন প্রসূত সম্পদ যা পেয়েছি—তা তুলে দিলাম আমার প্রিয় পাঠক ও শ্রোতাদের হাতে।

কাহিনীর কাঠামো যদিও তথ্যের, কিন্তু তার পরিপূরক বাস্তবের—এইটুকুর মধ্যে আমার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ। জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করে এ-কাহিনী রচিত নয়—তথাপি যদি কারো সাথে চরিত্রগত বা নামগত মিল হয়ে যায়, সেটা নিতান্তই আকস্মিক। তবে, ইতিহাস রক্ষার জন্যে যাঁদের অবতারণ, যাঁরা সার্বজনীন তাঁরা ঠিকই আছেন। তাঁরা আছেন বলেই ত' আমার এই প্রয়াস।

মুখার্জ্জীপাড়া লেন,
কালীঘাট কলিকাতা-২৬
১৫ই, আশ্বিন—১৩৬৬
মহালয়া

অজিত মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

"সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা, না স্রষ্টার জন্য সৃষ্টি"—তর্কবাগীশ জিজ্ঞাসা করলেন তর্কচঞ্চু মশাইকে। সে তর্ক দ্বন্দ্বের কি ফলাফল তা নিয়ে মাথা ঘামান তর্কচঞ্চু মশাইরা। আমি গল্পে লোক—গল্প বলা আমার কাজ। কখনও গল্প বলি—আবার কখনও গল্প শুনি। দুটোই আমার কাছে সমান প্রিয়। শ্রোতার তাগিদে কখনও গল্প বলি—আবার কখনও গল্প সৃষ্টি করে ডাক দেই প্রিয় শ্রোতাদের।

সর্বাণী আমার পুত্রবধূর নাম। সর্ব্বেশ্বর হালদারের প্রথমা কন্যা। যেমন বাপ, তেমন বেটি। মা আমার মূর্তিময়ী করুণা—যেমন তাঁর গুণ, তেমন তাঁর রূপ।

কেমন বাপের মেয়ে! পণ্ডিত বাপের মেয়ে হয়ত পণ্ডিত হতে পারেনি—তা বলে তিনি মূর্খ নন। যে কালে আর যে বংশে তাঁর জন্ম, সে কালে সে বংশের মেয়েরা ইস্কুল-কলেজের ধার ধার'ত না-বিশেষ কেউ। মা আমার ঘরে বসে পড়েছেন বাপের কাছে। সাহিত্য পড়েছেন, দর্শন পড়েছেন—শাস্ত্র নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন পণ্ডিত বাপের সঙ্গে—

শুধু কি তাই! আচার, বিচার, সেবা, ধর্ম্ম বহুগুণের আধার আমার সর্বাণী মা। তা'হলে কি হবে! তুষের আগুণে যে তাঁর বুকটা জ্বলে গেল হু হু করে।

—বোঝ্‌বার উপায় নেই।

বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না যে—তাঁর বুকের মধ্যে কত আগুন জ্বালা আছে। কতদিন ধরে জ্বলছে সে আগুন।

বড় সংসারে বড় ঝামেলা। এ সংসারের কর্ত্রী তিনি। তাঁর ঝামেলা কত! চতুর্দ্দিকে তাঁকে নজর ঘোরাতে হবে—কে এলো—কে গেল, কাকে কি দিতে হবে—আদর আপ্যায়ন এ সবকিছু যে তাকেই দেখতে

হয়। আর যাঁরা আছেন তারা'ত বড় বউয়ের হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। মা'র আমার ঝামেলা কত! তিন কন্যা আর এক পুত্রের জননী তিনি।

পুত্র! হ্যাঁ, পুত্রই বটে—

গুণধর পুত্র—মাতুলবংশের ধারা বজায় রেখে চলেছে। বউমার চোখে নিদ্রা নেই। ছেলে তার উচ্ছন্নে গেছে। ফেরাতে হবে তাকে সে পথ থেকে।

সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সর্ব্বাণী। বোঝ্‌বার উপায় নেই বাইরে থেকে দেখে। সদাহাস্যময়ী মায়ের হাসিটুকু ঠোঁটের কোনে লেগেই আছে। হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় মনের কালিমা।

কিন্তু ব্যথাটুকু! তার অন্তরের ব্যথা লুকবে কোথায়? ব্যথাভরা চোখ দুটি নিয়ে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়—তখন আর নিজেকে সামলাতে পারি না।

সন্ধ্যার পর এসে বসেন আমার কাছটিতে। বলেন,—বাবা গল্প বলুন।

যে কালীঘাটের জলবায়ুতে মানুষ হয়েছেন তিনি—যে কালীমন্দিরে সেবায় তাঁর বাপ-ঠাকুর্দার জীবনের উদয়-অস্ত কেটেছে সেই কালীঘাটের কথা শুনতে চান বউমা।

আজ তাঁর তাগিদেই বলতে হচ্ছে কালীক্ষেত্র কাহিনী—কালীমন্দিরের আজন্মের ইতিহাস। এর সকল কথাই কি আর আমার কথা! —শোনা কাহিনী। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ।—যেখানে যা পেয়েছি, যেমনটি পেয়েছি তা' পরম যত্নে স্মৃতির মনিকোঠায় তুলে রেখেছিলাম। দীর্ঘদিন পর বউমার তাগিদে তারই মালা গাঁথ্‌ছি।

আমার পিতামহকে সবাই বল্‌তেন কথক ঠাকুর। তিনি যেমন কথা কইতেন, তেমন জান্‌তেন অনেক কিছু। বল্‌তেন,—কালীঘাটের কথা!—সেকি আজকের কথারে? কোথায় তখন ক'ল্‌কাতা আর

'কোথায় বা কি ! সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রামেরও জন্ম হয়নি সেকালে। সমতট বলা হ'ত বাংলার এই দক্ষিণ অঞ্চলটাকে—সুন্দর বন বিস্তীর্ণ ছিল এদিক পর্য্যন্ত—হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।

সৃষ্টিস্থিতি শক্তি স্বরূপিনী মা জগদ্ধাত্রী আবির্ভূতা হয়েছেন এই গভীর বিপদ-সঙ্কুল বনে। নিরাকার মহামায়া আকার ধারণ করলেন,—সকল অন্ধকার ঘনীভূত করে রূপ গ্রহণ করলেন, মা জ্যোতির্ম্ময়ী। ভক্ত বৎসলা মা ডাক দিলেন তাঁর সকল সন্তানেরে—ওরে আয় আমার কোলে আয় তোরা—আয় একবার, মা বলে ডাক।

কিন্তু কোথায় ভক্তের দল আর কোথায় বা দর্শনার্থী। গভীর জঙ্গলে মাঝে মাঝে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হুঙ্কার, আর দু'চারজন কাপালিক সন্ন্যাসীর মা ভৈঃ চীৎকার।

তারই মাঝে বাসা বেঁধেছে বুনোজাতি নিষাদ, কিরাৎ প্রভৃতি—ধীবর, হাঁড়ি বাগ্‌দী এরাও আশ্রয় পেয়েছে সেই রাজত্বে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মাঝে। কার রাজত্ব—আর কেইবা প্রজা! জঙ্গলের মাঝে তারাই সৃষ্টি করেছে জনপদ। মায়ের রাজত্বে এরাই প্রথম প্রজা।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে ভীষণা স্রোতস্বিনী গঙ্গা। ভক্তিমতী গঙ্গা ডেকে আনে—ভক্ত প্রবরকে। বুকে করে ভাসিয়ে আনে তাদের। মায়ের স্থানে নামিয়ে দিয়ে যেন বলে—দেখে নাও মাকে ভাল করে—প্রার্থনা কর নিজেদের মঙ্গল। পুণ্যার্থীরা আসে বহুদিনের পরিশ্রমে। দল বেঁধে আসে তারা পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। এক আধ রাত্রি বিশ্রামও করে—অবশ্য যদি দলে ভারী থাকে। তা'নাহলে, তাদের আর কষ্টকরে স্বর্গে যাবার পথ তৈরী করতে হয় না। এখান থেকেই তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। কাপালিকের পাল্লায় পড়লে—তাকে হাড়িকাষ্ঠের মধ্যে মাথা গলিয়ে ডাকৃতে হয় মাকে,—শেষ বারের মত। হিংস্র জন্তুদের যদি একবার নেক্ নজর হয় তবে ত

আর কথাই নেই—লাফিয়ে এসে পড়বে তাকে স্বর্গে পাঠাবার জন্যে। ঠ্যাঙ্গাড়েরা'ত পিটিয়েই পাঠিয়ে দেবে স্বর্গে—বলবে,—দে বাপু, সগ্‌গে যাবার দক্ষিণাটা দে—

যাদের এত সহজে স্বর্গে যাবার সখ্‌ হয় না—তারা থাকে দলে ভারী হয়ে। নিজেদের রক্ষা করবার মত অস্ত্র থাকলেও মাঝে মাঝে তাদেরও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। যেমন তারা দল বেঁধে আসে জঙ্গলের মধ্যে কালী দর্শন করতে—তেমন দল বেঁধে চলে যায় ডিঙ্গা বোঝাই হয়ে কপিলা-শ্রমের দিকে। সাগরের সঙ্গে গঙ্গা যেখানে সঙ্গম করেছে—সেই দিকে। যেখানে শাপভ্রষ্ট সগর সন্তান গঙ্গাস্পর্শে মুক্তি পেয়েছিল, সেই কপিল ঋষির আশ্রমে।

সওদাগরেরা বাণিজ্যে যেতেন এই পথ দিয়ে। বিশ্রামের জন্য ডিঙ্গা বাঁধতেন এইখানে। শ্রীমন্ত সওদাগর চলেছেন বাণিজ্য করতে। বহু ডিঙ্গা বোঝাই করেছেন বাংলার পণ্য দিয়ে। বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে চলেছেন বিনিময় বাণিজ্য করতে।

পাট, শন, হলদি, নারকেল, চিনি, নিমকাঠ প্রভৃতির বিনিময়ে আনতেন—শ্বেত-চামর, কর্পূর, চন্দন-কাঠ, আরো কত মূল্যবান সামগ্রী। সওদাগর মুনাফার হিসাব করতেম আঙ্গুলের কর গুণে—আর মনটা ফেলে রাখতেন দেবস্থানে, দেবতার পায়ে।

পড়ন্ত বেলা, পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা হয়ে দেখা দিয়েছে। মাঝি-মাল্লা লোকজন সকলেই বেশ পরিশ্রান্ত। স্থানটুকু বেশ নিরিবিলি—নিথর, নিস্তব্ধ জায়গা। বহু ডিঙ্গা বাঁধা আছে রাত্রের বিশ্রামের জন্য। বহু ডিঙ্গা, বহু লোকজন তবুও কোন হল্লা নেই; কোন আওয়াজ নেই—চিরশান্তি বিরাজিত এই স্থান।—এখানেই ডিঙ্গা বাঁধার হুকুম দিলেন ধনপতি সওদাগর। সেদিনের মত চলার বিরাম হোলো সেখানে।

॥ দুই ॥

পাশেই ঘাট, কাঁচা ঘাট। কয়েকজনের প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে সেটি। জঙ্গলবাসী কাপালিক সন্ন্যাসীরা আসে সেই ঘাটে—স্নান করে, জল ভরে নিয়ে যায় কলসীতে করে মায়ের পুজোর জন্যে। এক আধটা হরিণ-টরিণও নেমে আসে ঘাটের পাশ দিয়ে, চক্ চক্ করে জল খায় নদী থেকে, নৌকা-যাত্রীদের চোখ আড়াল করে। মা কালী স্বয়ং স্নান করেন এ'ঘাটে—ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। এ ঘাট তাঁরই—নাম "কালীর-ঘাট"—এই সেই কালীঘাট। একান্ন পীঠের এক অন্যতম পীঠ।

সতী-অঙ্গখণ্ড পড়েছিল এইখানে—আদি-গঙ্গার তীরে এই সেই পুণ্যভূমি। মাকে যে এখানে আসতেই হবে—এ যে তাঁর নির্ব্বাচিত স্থান। মায়ের ইচ্ছা প্রকাশ এখানে। তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল দুটি ছেলে—ব্রহ্মানন্দ গিরি আর আত্মারাম ব্রহ্মচারী। কোটি সন্তানের জননী ডাকে আরো সন্তানেরে।

ধীরে ধীরে নামলেন শ্রীমন্ত সওদাগর সেইঘাটে। হাত-মুখ ধুয়ে শুদ্ধাচার হয়ে নিলেন—উপাচার সংগ্রহ করে পুজো দিলেন কালীমায়ের চরণে। সঙ্গী-সাথীদের ডেকে দেখালেন মায়ের করালিনী মূর্তি। শঙ্খ আর ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো আরতি করলেন সন্ন্যাসীরা। সন্তানের সমাবেশ দেখলেন জননী। তৃপ্তি হলো—মা খুসী হলেন মনে মনে। যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটি হোলো।

জ্যোতির্ময়ীর চোখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ—বলছেন, সকল সন্তানকে—যাতায়াতের পথে একবার আমার সাথে দেখা করিস বাপু।—যার ভক্তি আছে সেইত ভক্ত। একমাত্র ভক্তই শুনতে পায় জননীর প্রচ্ছন্ন উক্তি।

আঁদি গঙ্গা।

এই সেই আদি গঙ্গা,—সাগরে যাবার পথ। কত লোক আসা-যাওয়া করে এই পথ দিয়ে—বাদাম তোলা ডিঙ্গা চলে ঝাঁকে ঝাঁকে, পালে পালে। চাঁদসওদাগর তার মধুকর সহ সপ্তডিঙ্গা নিয়ে যাতায়াত করে ছিলেন এই পথে কালীঘাটের কূল দিয়ে।

সতী বেহুলা ভেসে গিয়েছিলেন এই পথ দিয়েই। এই গঙ্গার বুকেই কলার ভেলায় করে ভেসেছিলেন তিনি মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে।

পরম বৈষ্ণব মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁর পদস্পর্শে ধন্য করেছেন কালী-ক্ষেত্রের এই ভূমিকে। এই আদি গঙ্গার তীর ধরেই তিনি গিয়েছিলেন হরিনাম বিলোতে বিলোতে ছত্রভোগের দিকে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করতে।

মা গঙ্গার আজ আর সে অবস্থা নেই। বুকে করে ভাসিয়ে আনে না কাউকেও, কালীঘাটের কূলে নামায় না কোন বিদেশীকে। পড়ে আছেন মরণাপন্না হয়ে। কুলবর্ত্তিনীরা তাঁকে গাল দেয় কুলখাগী বলে। দশরথমাঝি নৌকার হাল ধরে সুরের পরশ লাগায় মনের কথায়; ডাকছেড়ে গায়—“ওরে নদী নামে বধূ আমার কুল মজালি আজ”—

আদি বঙ্গে বানিজ্যকেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্তে, যাকে আজকাল আমরা বলি তমলুক। তাকে পর করে দিলেন মা গঙ্গা। আত্মীয়তা করলেন সপ্তগ্রামবাসীদের সাথে। তাঁর ত্রিমুখী ধারা চল্‌লো তিন দিকে—মা গঙ্গার যমজ কন্যা প্রসব হয়েছে এখানে, সরস্বতী আর যমুনা। ডানদিকে সরস্বতী, বাঁদিকে যমুনা, মাঝে রইলেন তিনি স্বয়ং—নাম হয়েছে ত্রিবেণী।

সরস্বতীর কূলেই ছিল সপ্তগ্রাম। সরস্বতী নদীর মৃত্যুর সাথে সাথেই সপ্তগ্রামেরও মৃত্যু হোলো—শেঠ বণিকদের বাস উঠলো সেখান থেকে।

নিশ্চিহ্ন হোলো বন্দর সপ্তগ্রামের ইতিহাস। এরাও পর হয়ে গেল মা গঙ্গার। মনের দুঃখে মুহ্যমান হয়ে রইলেন তিনি।

এই দুঃখের দিনে তাঁর অঙ্গে আঘাত করল স্বার্থান্বেষী মানুষেরা—অস্ত্রের আঘাত করল তারা। আদিগঙ্গার আদি প্রবাহকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় মাথা ঘামালো জন কয়েক পাকা মাথাওয়ালা স্বার্থান্বেষী মানুষ।

লজ্জায় অপমানে আর মনোকষ্টে শুখতে লাগলেন তিনি—দিনে দিনে শুকিয়ে কঙ্কাল সার হলেন মা গঙ্গা। অস্তিসার দেহ নিয়ে চিন্তা করেন রুগ্না জননী গঙ্গা,—কী ছিলাম আর কী হয়েছি আজ!—কত গ্রাম ছিল তাঁর দু'কূলে, একে একে মনে পড়ে তার গ্রামকে। মজিলপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, মগরা, দক্ষিণবারাসত, বোড়াল, রাজপুর, ছত্রভোগ আরো কত সব গ্রামের কথা মনে পড়ে তাঁর মরণ দশায় প'ড়ে।

মগ্‌রা—যে মগরায় ধনপতি সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা ডুবেছিল, সে কথা স্মরণ করে তাঁর দুঃখ যেন উৎলে উঠে। বলেন, হিত অহিত যা কিছুই করে থাকি তোমাদের—তা' বোলো তোমাদের বংশধরের কাছে। তারা যেন ভুলে না যায় পিতৃ-মাতৃ ভূমির অতীত ইতিহাস।

আজকাল কত কথাই উদয় হয় তাঁর স্মৃতিপটে। কত বণিক কত রাজা বাদশাহ যাতায়াত করেছেন মা গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে। তাদের সুখ সুবিধার জন্য গঙ্গার কূলে ছিল মঠ, মন্দির, দীঘি আর পান্থশালা। সমুদ্রের লোনা জলে পৌঁছবার আগে যাত্রীরা তীরে নামতেন, পুজো দিতেন মঠ আর মন্দিরে। এক আধ দিন বিশ্রাম নিতেন পান্থশালায়। আজও সে মঠ মন্দিরের চিহ্ন আছে—খুঁজে পাওয়া যায় মিঠে জলের দীঘির অস্তিত্ব। মা গঙ্গা লুপ্ত হয়েছেন সেখান থেকে—পড়ে আছে স্মৃতিটুকু। সেই স্মৃতি রেখার উপর দিয়ে দম্ভ ভরে ছুটে চলেছে রেলগাড়ী—বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর প্রভৃতির রেললাইন পাতা হয়েছে সেখানে।

কালীক্ষেত্রের কূলে মা গঙ্গার অস্তিত্ব কোন রকমে বজায় আছে আজ—মুমূর্ষু রুগীর অবস্থা হয়েছে তাঁর। গঙ্গার দু'কূল ভরা জমিতে গড়ে উঠেছে জনপদ। মায়ের মন্দিরের বর্ত্তমান নহবৎখানা পর্য্যন্ত ছিল মা গঙ্গার কূলের সীমানা। সেখানেই ছিল কালীমায়ের ঘাটের সিঁড়ি। মায়ের সেই ঘাটের স্মৃতি বুকে নিয়ে শুয়ে আছে, গঙ্গার কূলভরা জমিতে কালীঘাট রোড আর টালীগঞ্জ। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে চেৎলা রোড, ধান-চালের মিল, আর আলিপুর জেলখানা তখন ছিল কোথায়? তারাও'ত গঙ্গার চড়ার উপর দাঁড়িয়ে বসে, শুয়ে স্বীকার করে তাঁর বিশাল মূর্তির কথা। বলে,—হ্যাঁ, মা গঙ্গা পাঁচ'শ বছর পূর্বেও এদিকে প্রসস্থা ছিলেন।

বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক বিষ্ণু উপাসক রাজা বল্লাল সেন এদেশে রাজত্ব করতেন দ্বাদশ শতকের শেষভাগে। তাঁর রাজত্ব-কালে কালীক্ষেত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ, এক ব্রাহ্মণকে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন তিনি।

সে যুগে অনেক পুণ্যার্থী, অনেক পাপীতাপী আস্‌তেন কালীক্ষেত্রে গঙ্গার স্নানে। এই পুণ্যভূমিকে স্পর্শ করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপমুক্ত হতেন—মোক্ষ লাভ করতেন তারা।

বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রসার উদ্দেশ্যে সেনরাজা এমন দানপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন সেই যুগে—যে যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের বাড়াবাড়ী ছিল।

রাজা মহারাজা থেকে সুরু করে উঁচু-নীচু, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সবাই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও বৌদ্ধধর্ম্মী হয়েছিল বটে—কিন্তু আদিম প্রবৃত্তি তারা ছাড়তে পারেনি।

জীবহত্যা করা—নররক্ত, পশুরক্ত দিয়ে দেবতার তুষ্টি সাধন করা ছিল তাদের প্রবৃত্তির বিশেষ অঙ্গ। ধর্ম্মের ছাঁচে ফেলে সেই আদিম

প্রবৃত্তিকে কাজে লাগালো তারা। তাদের দেব আরাধনার পদ্ধতিকে বলা হোলো—বৌদ্ধতান্ত্রিক পদ্ধতি। তন্ত্র মন্ত্রের বাহুল্যতা দেখা দিল সে কালে।

তন্ত্রসাধক কাপালিক সন্ন্যাসীদের বীভৎস ক্রিয়াকলাপ এক তাণ্ডব-লীলায় পরিণত হোলো। দশমহাবিদ্যার দশমূর্তি নতুন রূপে পূজা পেলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের কাছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শাক্তরা উঠলেন মাথাচাড়া দিয়ে। বৌদ্ধ মন্দিরগুলো শিব ও শক্তি মন্দিরে রূপায়িত হোলো। জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দির,—ঢাকায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির,—কুচবিহারে বাণেশ্বর মন্দির,—তমলুকে বর্গভীমা মন্দিরগুলো আজও সে যুগের সাক্ষী হয়ে আছে।

জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মা মহামায়া সেই তান্ত্রিক সন্নাসীদের সাধনায় জাগরিত হয়ে রইলেন।

কালীক্ষেত্রে মায়ের আবির্ভাব হয়েছে—মায়ের কথা পৌঁছে গেছে দেশ দেশান্তরে। অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গের আনাচে কানাচে। পূবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে।

পশ্চিমবাসীরা আসতেন কালীক্ষেত্রে দক্ষিণা কালী দর্শন করতে। সাগরে যাবার পথে এখানে নাম্‌তেন নৌকো থেকে। বলতেন—"কালিকা স্থান।" পশ্চিমের গ্রামীন লোকেরা বলতেন—"কালী-কোঠা"—কোঠা মানে মন্দির বা মন্দিরের মত একটা কিছু—যেখানে দেবতা অবস্থান করেন।

সেই কালী-কোঠাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে কলিকাতা নামের উৎপত্তি। ভক্ত জনের তাই বিশ্বাস। কালীক্ষেত্রের অংশই ত কলিকাতা।

॥ তিন ॥

কল্‌কাতার পত্তন হোলো। সহর পত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে কালীক্ষেত্রের সীমা রেখা পড়ল। তা' পড়লে কি হবে? ভীড় বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। অগনিত সন্তানের মধ্যে মাতৃদর্শনের তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। আসে অনেকেই আবেদন নিবেদন করতে। আসে আর্য-অনার্য, হিন্দু খৃষ্টান, ডাচ্‌-ওলান্দাজ, ইংরেজ বহু দেশের বহু ছেলে।

সেবার পলাসী যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ যখন জয়ী হোলো—তখন তাদের সৈন্য সামন্তরা আনন্দ উল্লাস করতে করতে এসেছিল কালীঘাটে। কল্‌কাত্তেবালী কালীকে দর্শন করতে। তাদের বিশ্বাস কল্‌কাতার অধিষ্ঠাত্রী কালীঘাটের কালীকাদেবী। তাই তারা প্রণামের সঙ্গে বলে, —"জয় কালী কলকাত্তেবালী।"

শুধু ইংরেজ পক্ষের সৈন্যর কথা বলি কেন?—বহু-ইংরেজও আসতেন কলকাত্তেবালী কালীকে পুজো দিতে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারীটি ইংরেজ হলে কি হবে?—মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালী। মামলায় জড়িয়ে মনে মনে ডাকতে লাগলেন মা কালীকে, রক্ষাকর মা,—বলে।

মাঝে মাঝে আস্‌তেন তিনি কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে—মাকে দর্শন করতে। চোখ বুজে হাতজোড় করে নিবেদন করতেন অন্তরের কথা। ভাষা তার যাই হোক—যেকোন ধর্ম্মই তার অবলম্বন হোক না কেন অন্তরের সেই একই কথা। একই কাকুতি-মিনতি।

সাহেবের অন্তর মায়ের চরণে গড়াগড়ি যেত। ভাবতেন তিনি বিধর্ম্মী—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের রক্ত তাঁর শিরায় উপশিরায়। মনে মনে ভয় হ'ত

তাঁর—চোখ দুটি ছল-ছলিয়ে উঠতো,—দু'ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ত মায়ের উদ্দেশ্যে।

মা যে জগৎ জননী। বিশ্বজোড়া তার লক্ষকোটি সন্তান। তারা সবাই কি এক রকম?—তাদের কত মত—কত পথ! সব পথের মিলনইত একস্থানে—সেই ব্রহ্মময়ীর চরণতলে। সেখানে কোন বিচার নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন জাত নেই।

মা আর সন্তান এই সম্পর্ক সেখানে। সেখানে আর কোন সম্পর্ক নেই, ভাষা নেই,—ধর্ম্ম নেই। হোলই বা ভক্তটি ইংরেজ—তাতে কি আসে যায়? মা বলে ডেকেছে সে,—তা' যে ভাষাতেই ডাকুক। অন্তর তার একই কথা বলে—মা ব্রহ্মময়ী।

মা সাহেবকে রক্ষা করলেন। মামলায় জয়ী হোলো কর্ম্মচারীটি। জয়ী হয়ে সাহেব ছুটে এলেন কালীঘাটে—প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ করে মা কালীর পুজো দিয়েছিলেন ইংরেজ কর্ম্মচারীটি।

মহারাজা নবকৃষ্ণ কালীঘাটে এসে পুজো দিয়েছিলেন একলক্ষ টাকা খরচা করে। করবেন না কেন?—মুন্‌শী হলেন রাজা—সে আবার যে সে রাজা নয় একেবারে মহারাজা।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী। নবকৃষ্ণ মুন্‌শী তাঁর ফার্সী পড়াবার শিক্ষক। হেষ্টিংস্ সাহেব বুঝেছিলেন যে—এদেশের মাটিতে শেকড় গাড়তে হলে—এখানকার অনেক কিছু তাকে আয়ত্ব করতে হবে। এদেশের লোকের সাথে মিশ্‌তে হলে, তাদের রীতি-নীতি, খাওয়া দাওয়া, অনেক কিছুই শিখ্‌তে হবে—বেকায়দায় পড়ে তাকে পান্তাভাত খাওয়া শিখতে হয়েছিল।

কিন্তু প্রজাদের সাথে মিশ্‌লেত চলবে না-নবাব বাদশার সাথেও মিশতে হবে। রাজকার্য্য চালাতে হবে তাকে। এই ছোট বাসনাটুকু তার মনের কোণে ছিল অতি গোপনে। তাই রাজদণ্ড যার হাতে সেই নবাব বাদশার ভাষা শিখ্‌ছিলেন হেষ্টিংস্ সাহেব, নবকৃষ্ণ মুন্‌শীর কাছে।

কালে কালে হোলোও তাই। হেষ্টিংসের ভাগ্যচক্র ঘুরে গেল। মনের কোণের ছোট্ট বাসনা মিটল একদিন।

হেষ্টিংস বাংলার গভর্ণর হলেন। নবকৃষ্ণ মুন্‌শীর আনন্দ কত? গভর্ণর হেষ্টিংস্ কে—না, নবকৃষ্ণ মুন্‌শীর ছাত্র! যা-তা কথা নয়।

সেই প্রিয় ছাত্রের কৃপায় নবকৃষ্ণ পেলেন জমিদারী। জমিদারী থেকে রাজা। রাজা থেকে মহারাজা। মহারাজার আবার টাকার অভাব? কালীঘাটে এসে তিনি লক্ষটাকা খরচ করে পূজো দিয়েছিলেন এ আর বড় কথা কি?

মায়ের শ্রাদ্ধে তিনি নয়-লক্ষ টাকা খরচের ফর্দ করে—খরচা করে-ছিলেন তার থেকে অনেক বেশী। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি নবকৃষ্ণ মুন্‌শী নন,—মহারাজা নবকৃষ্ণ।

কৃষ্ণনগর থেকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এসেছিলেন কালীঘাটে কালীদর্শন করতে—গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে। পলাশীযুদ্ধের কিছু আগেই ঘন ঘন আসতেন তিনি—লম্বা পাড়ি দিতেন কৃষ্ণনগর থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত। মাঝ পথে নেমে ইংরেজ প্রধানদের সাথে গোপনে পরামর্শ হোতো। বলতেন, সাহেব তোমার জয়ের সূচনা ঘটিয়ে দেব কিন্তু আমার কি হবে সাহেব?—

সেই প্রশ্ন করতেন তিনি কালীঘাটে এসে, কালীমায়ের সাম্‌নে, মাগো! আমার কি হবে?

—এইত সেইদিনের কথা।

কালীঘাটে তখন লোক গীস্ গীস্ করছে। কালীমন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মস্ত ব্যবসা-কেন্দ্র, কেউ বেচে পূজোর নৈবেদ্য—কেউ সেই নৈবেদ্য পূজো করে আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে। মন্দিরের আসে পাশে কতলোক কত পসরা। কত ক্রেতা কত বিক্রেতা—চব্বিশ ঘণ্টা লোক গীস্ গীস্ করে কালীঘাটে।

আঠারো'শ বাইশ সালের কথা। রাজা গোপীমোহন এসেছিলেন কালীঘাটে কালীমায়ের পূজো দিতে। তখনত রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল কালীঘাট অঞ্চলে। হৈহৈ ব্যাপার। কয়েকঘণ্টা আগে থেকেই লোক জড়ো হতে স্বরু করল কালীমন্দিরে আর রাস্তার আশে পাশে। এত লোক জড়ো হয়েছিল যে পুলিশকেও হিম্‌সিম্ খেতে হয়েছিল সেদিনের ভীড় ঠেকাতে।

পিতামহের মুখে যখন এসব কাহিনী শুনতাম তখন পুলকিত হতাম, রোমাঞ্চিত হতাম মনে মনে। এই কালীঘাটকে আরো বেশী করে জানবার বাসনা নিয়ে নানান প্রশ্ন করতাম পিতামহকে।

তাঁর পূর্বপুরুষ জনার্দ্দন মুখুজ্যে একবার এসেছিলেন কালীঘাটে, কালীক্ষেত্র ভূমিতে অবতারণ করে মায়ের সাম্‌নে বসে ধ্যান করে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

বিশ-পঁচিশ জনের একটা যাত্রী দলের তীর্থগুরু হয়ে তাঁকে আসতে হয়েছিল,—সেই ঘটনার কথা আগে বলি।

॥ চার ॥

পাঁজি পুঁথি খুলে দিনক্ষণ দেখে তীর্থ যাত্রার দিন ঠিক করা হোলো। সে যাত্রার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জমিদার ত্রৈলোক্য নারায়ণের বিধবা কন্যা তরুলতা। দ্বাদশ তীর্থ দর্শন করে তিনি পুণ্যকর্মা হবেন—যশস্বিনী হবেন। এই তাঁর বাসনা। পুণ্য কাজের ব্যয়ভার বহন করে তিনি পুণ্যকীর্ত্তি রেখে যাবেন এজগতে। মঠ মন্দির গড়ে স্মরণীয়া হবেন রাজ-নন্দিনী।

সঙ্গে যাবেন নায়েব ভুজঙ্গ চক্রবর্ত্তী তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে—আপন শিশুপুত্রকে সাগরে বিসর্জ্জন দিতে। এমন ধারা অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি সন্তান কোলে পাবার আগে—

বন্ধ্যা স্ত্রীকে নিয়ে চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের যত ভাবনাচিন্তা। তাঁর বংশ বুঝি লোপ পেয়ে যায়। নায়েবগিন্নী অবশেষে শিব তলার যোগীবুড়ীকে ধরে বসলেন—আমার একটা উপায় কর বুড়িমা, আমায় কোল ভরে দাও।

যোগীবুড়ী, তিথি নক্ষত্র দেখে যোগ-টোগ সাধন করেন। জড়ি বড়ি দান করেন বন্ধ্যা নারীদের মাঝে। লোকে তাই বলে যোগীবুড়ী।
বুড়ীমা বললেন—পারি তোর কোল ভরে দিতে, তোর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দিতে, কিন্তু আমার কথা রক্ষা করতে পারবি'ত?

পারব—

—তোর প্রথম সন্তান সাগরে বিসর্জ্জন দিতে পারবি?

—হ্যাঁ পারব,—কিন্তু আমার কোল ভরে রাখবে'ত?

রাখব বৈকী—বললেন যোগীবুড়ী। যে আমাকে রাখবে, আমি তাকে রাখব।

যোগীবুড়ী তার কথা রেখেছেন। তাই তাঁর কথা রাখবার ব্যবস্থা করলেন নায়েব মশাই আর নায়েবগিন্নী।

ষোল দাঁড়ের বজরা দাড়ালো চৌধুরীদের ঘাটে। তীর্থযাত্রী তরুলতার

সাথে যাচ্ছেন নায়েবগিন্নী সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিতে। লোকজনে ভরে গেছে চৌধুরীদের ঘাট, এমাথা থেকে ওমাথা। সকলে দেখতে চায় দেব-উৎসর্গ করা শিশুপুত্রকে।

সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট মাসখানেকের শিশুপুত্র। নির্দ্দিষ্ট দিনে এজগৎ ছেড়ে চলে যাবে—সাগরের অতল তলে।—তাই, চোখ ঘুরিয়ে দেখছে সবাইকে মায়ের কোলে শুয়ে! দেখ্ছে জগৎটাকে, সবাইকে দেখছে, জনক জননীকে দেখছে, তরুলতাকে দেখছে আড়চোখে।

শিশু কোলে করে জননী বসে আছেন পাথরের মূর্তির মত নির্ব্বাক হয়ে। চোখে তার দরবিগলিত ধারা।

জমিদার দুহিতা দৃঢ়স্বরে বল্লেন নায়েব গিন্নীকে— তোমাকে কঠিন হতে হবে সুরবালা, যে ব্রতের যেমন বিধি; মায়া কান্না কেঁদ না।
তাতে কি আর সুরবালার কান্না থামে? সারাক্ষণ তিনি কেঁদে কাটালেন—। কত দিন কত রাত কাটিয়ে আদি গঙ্গা বয়ে বজরা ভাসিয়ে নিয়ে এল একদল পুণ্যকামীদের—তাঁরা এলেন কালীক্ষেত্রে।

বজরা বাঁধা হয়েছে কালীক্ষেত্রে কালীর ঘাটে; তরুলতা পুজো দেবেন এখানে। তীর্থগুরু জনার্দ্দন মুখুজ্যে নামলেন বজরা থেকে। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তিনি, পরণে তাঁর রক্ত বসন, গলায় রাঙ্গা উত্তরীয়, সারা অঙ্গে রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার।

বাধা দিলেন বৈদ্যরাজ নকড়ি সেন। বললেন, রাণীমায়ের এখানে অবতারণ কি উচিত হবে গুরুদেব? হিংস্র জন্তুজানোয়ারে ভরা জঙ্গল; তার থেকেও হিংস্র দস্যু-তস্কর আর কাপালিক সন্ন্যাসীর আড্ডা আছে এখানে।

মুচ্কি হাসলেন গুরুদেব, ভয় নাই, বলে অভয় দিলেন সকলকে। বললেন, সব ভয় সঁপে দাও অভয়ার শ্রীচরণে।

গুরুদেব যেন সংসারের কত্তা মশাই। সকলকে দেখছেন, সকলের কথা শুনছেন, চলারপথের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন তিনি। সকলের আবেদন নিবেদন পৌঁছে দিচ্ছেন ব্রহ্মময়ীর চরণে। গুরুই'ত পথের কর্ত্তা।

দলবল সহ অগ্রসর হলেন তিনি জঙ্গলের মাঝে দক্ষিণাকালীর পূজো দিতে। বজরায় রইলেন বৈদ্যরাজ সেন মশাই, সুরবালা রইল আপন শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে। কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেছে বাছা।

আর এক পক্ষ কাল।

পক্ষকাল পরেই ধূপদীপ জ্বালিয়ে,-কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে সমুদ্র বক্ষেই পূজো করতে হবে সুরবালাকে। তার পর মন্ত্র উচ্চারণ করে সাগরের অসংখ্য তরঙ্গ মাঝে বিসর্জ্জন দেবে তার আপন শিশুপুত্রকে।

কাকুতি মিনতি করছে সুরবালা। সন্তান বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, পারব না ; কিছুতেই পারব না একে বিসর্জ্জন দিতে।

ঝংকার দিয়ে উঠলেন রাজনন্দিনী তরুলতা, কেন তবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে, কেন আমার সকল ব্যয় পণ্ড করলে, পুণ্য সঞ্চয়ের অন্তরায় হয়ে ? উত্তেজিত হয়ে হুকুম দিলেন সঙ্গের দাসদাসীদের, ছিনিয়ে নাও ঐ সন্তান, মায়াবিনীর কোল থেকে। প্রয়োজন নেই সাগর সঙ্গমের অপেক্ষায় থেকে—এইখানে কালীঘাটের আদিগঙ্গা-বক্ষে বিসর্জ্জন দাও সন্তানটিকে।

বিকট চিৎকারে আর্তনাদ করে উঠলো সুরবালা সন্তানকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, তোমার আর কি ? যদি মা হতে, তবে বুঝতে মায়ের ব্যথা। পাষাণী, সরে যাও আমার চোখের সম্মুখ থেকে।—মা হয়ে যে সন্তান খেতে চায়—সে যে ডাইনী।

মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে গেছে সুরবালার। বজরাময় ছুটোছুটি করছে, কোথায় সে সন্তান লুকবে। চোখদুটো দিয়ে তার আগুণ ঠিক্‌রে পড়ছে, সেই দিন রাত্রে বজরা ছেড়ে চলে গেল সুরবালা—আঁধারে আঁধারে চোরের মত পালিয়ে গেল সে। তরুলতার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে দিল।

বেতন ভোগী কর্ম্মচারী নায়েব-পত্নীর এত সাহস ! এই ব্যয়বহুল তীর্থদর্শন করে নির্ব্বিঘ্নে ফিরতে পারলে তবে অক্ষয় পুণ্য হবে, নাম হবে, যশ হবে। সে কথা সুরবালা একবারও—

সুরবালা যে মা। মা হয়ে মায়ের কাজ করল সে। নিঃসন্তান রমণী তার কতটুকু বুঝবে?

বোঝে বৈ কি—

আবাল্য বিধবা তরুলতা। তাই তার মা হবার প্রচ্ছন্ন বাসনা কেঁদে উঠে বুকটার মধ্যে। মা হবার স্বাদ পায়নি কখনও—সে স্থান শুকিয়ে পাষাণ হয়ে আছে। কালীক্ষেত্রে মায়ের স্থানে এসে সে পাষাণ ভেঙ্গে টুক্‌র টুক্‌র হয়ে গেল। সুরবালা ভেঙ্গে দিল সে পাথরখানা। তরুলতা অনুভব করল সে ব্যথার কণিকা মাত্র।

মা যে সর্ব-মঙ্গল্যে মঙ্গলময়ী—তিনি বোঝালেন তরুলতাকে। নির্ব্বাক হয়ে রইলেন তরুলতা—সারা রাত্রি চিন্তা করলেন সুরবালাকে—সে মা। মাতৃত্বের কাছে তরুলতা পরাস্ত হোলো। মায়ের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন তিনি। ভোরের দিকে জগজ্জননী স্বপ্নের ঘোরে দেখা দিলেন। আদেশ করলেন—তোরা গুরুর কথা শোন, ঘরে ফিরে যা। সংসার সাগরে গুরুই একমাত্র তরণী—আমার আদেশ সেই নির্দ্দেশ করবে। সুরবালাকে আমি নিলাম—সে আমার কাছে থাক।

সে সময় জঙ্গলের মাঝে মায়ের মন্দির গড়ছিলেন রাজা বসন্ত রায়। কাঁচা মন্দিরের বদলে পাকা মন্দির গড়ে দিচ্ছিলেন দক্ষিণাকালীর জন্যে। এমন দিনে দু'দশজন কারিগর কর্ম্মচারী আছে মন্দিরের কাজে আশে-পাশে—সাধু-সন্ন্যাসীর আনাগোনা রয়েছে দিনে রাত্রে; তারই মাঝে সুরবালা মিলিয়ে গেল কর্পূরের মত।

মহা ভাবনায় পড়লেন তীর্থগুরু। একি কলঙ্ক তীর্থ করতে এসে! কোথায় গেল সুরবালা ছুটে এলেন তিনি জঙ্গলের মাঝে—তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সারা জঙ্গলময়।

খবর পেয়ে রাজা বসন্ত রায় নিজেও খোঁজ করলেন—কিছুতেই কিছু নয়। কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা সুরবালার।

অবশেষে ধ্যানে বসলেন তীর্থগুরু জনার্দ্দন মুখুজ্যে—একটি মাত্র বাসনা নিয়ে। সুরবালা কোথায়, কি অবস্থায় আছে সে—এইটুকুই তাঁর জানার বাসনা।

ধ্যানে জানতে পারলেন তিনি—সে ত এখানেই আছে। আমার মন্দিরের পাশেই তাকে আশ্রয় দিয়েছি—বললেন, মা ব্রহ্মময়ী।

চোখ চাইলেন গুরুদেব। দেখলেন, সুরবালা বসে আছে মন্দির কোণে যবুথবু হয়ে—সন্তানটিকে বুকে চেপে নিয়ে। রাজা বসন্তরায় দেখতে এলেন তাকে—তরুলতা এলো, লোকজন সবাই এলো—পিছন পিছন এলেন নায়েব ভুজঙ্গ চক্রবর্ত্তী বালকের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদছে আর কি সব বলছেন বিড় বিড় করে।

সবাইকে একসঙ্গে দেখে সুরবালা ভয়ে জড়োসড়ো হয়েছে—অভয় দিলেন গুরুদেব, বললেন,—কোন ভয় নেই মা। কেউ তোমার সন্তান কোলছাড়া করবে না।

গুরুদেবের মুখে সব কথা শুনে রাজা বসন্ত রায় বিস্মিত হলেন। সুরবালার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে বললেন—ভয় পেওনা— তোমার কোন ভয় নেই মা। রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য আমি। রাজা বসন্ত রায়, তোমাকে বলছি, কোন ভয় নেই। এই বুড়ো ছেলে তোমার সেবা করবে—তুমি সুস্থ হও।

সুরবালার জন্যে সে স্থানে একটা কুটীর নির্মাণ করেছিলেন রাজা বসন্ত রায়। ভক্তের ধারণা সুরবালা আজও বসে আছেন কালীমন্দিরের একপাশে সন্তানটিকে কোলে নিয়ে। ব্রহ্মময়ী কৃপা করেছেন তাকে— ঠাঁই দিয়েছেন মন্দির চত্বরে। তাই পুত্রবতী আসে সন্তানের দীর্ঘায়ু

কামনা নিয়ে। প্রণাম জানিয়ে বলে—আমার সন্তানটি রক্ষা কোরো মা—অমন ধারা করে।

জগৎ-প্রসবিনী মা জগদম্বা।

জগতের কল্যাণ কামনা করেন। সন্তান ধনে-জনে গৌরবান্বিত হয়ে উঠুক এই ত মায়ের কামনা। সন্তানের গৌরবে মা যে গরবিনী।

আদ্যাশক্তি মা মহামায়া ইচ্ছা করলেন পৃথিবী সৃষ্টি হোক। তিনি সৃষ্টি করলেন ত্রিগুণ বিশিষ্ট এক অদ্বৈত পুরুষকে। সেই পুরুষ প্রধানের বক্ষ থেকে তিনজন দেবতার সৃষ্টি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর। জগজ্জননী তিনজন দেবতাকে দিলেন কর্ম্মের দায়িত্ব। প্রজা সৃষ্টি করবেন রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা, প্রজাপালন করবেন সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণু, আর প্রজা সংহার করবেন তমোগুণাত্মক মহেশ্বর। এর পর ভগবতী বললেন, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কর—ভিন্নরূপে আমাকে তোমরা পত্নী রূপে পাবে।

আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী দেবী নিজ শক্তি তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম অংশ থেকে ব্রহ্মশক্তি সাবিত্রী, দ্বিতীয় অংশ থেকে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী, সরস্বতী আর তৃতীয় অংশে শিবশক্তি গঙ্গা, গৌরী রূপে অবতীর্ণা হলেন।

তারপর চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী সৃষ্টি হোলো।

মরীচি, আঙ্গিরা অত্রি প্রভৃতি দশজন মানস-পুত্রের সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা। রাজা সৃষ্টি হোলো, প্রজা সৃষ্টি হোলো দিনে দিনে। সৃষ্টির আর বিরাম নেই। সেই অনাদি কাল থেকে মায়ের সৃষ্টিলীলা চলেছে জগৎময়।

মায়ের যেমন ইচ্ছা। যাকে দিয়ে যা করাতে চান। রাজ্য সৃষ্টি করলেন—রাজা পাঠালেন, প্রজা দিলেন, প্রজা পালনের শাসন অনুশাসন গড়ে দিলেন। জন্ম হোলো, মৃত্যু হোলো—সুখ দুঃখ এলো। কামনা বাসনায় পূর্ণ করলেন মানুষের মন। সংসার মাঝে গুরু পাঠালেন—তিনিই জানেন গুপ্ত পথের ঠিকানা—অক্ষয় মোক্ষ লাভের পথ।

বৈদ্যরাজ ন'কড়ি সেন এসেছিলেন তীর্থ দর্শনে—তীর্থযাত্রীদের সাথে। কিন্তু, তার মনে ছিল রোগ নিরাময়ের চিন্তা—কঠিন রোগগ্রস্ত রোগী ছিল তাঁর হাতে—সেই চিন্তায় মগ্ন থাকতেন তিনি। মন্দার-মঞ্জরী খুঁজ্‌ছিলেন মনে মনে; তাই দিয়ে তিনি নিরাময় করে তুলবেন রোগীকে। দিবানিশি তারই স্বপ্ন দেখেন—ভাবেন, এই বুঝি পেলেন।

কালীক্ষেত্রের জঙ্গলে নাম্‌লেন বৈদ্যরাজ—মন্দার-মঞ্জরীর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে মিশে গেলেন খোঁজ্য বস্তুটির সাথে। ভয় ডর ভুলে গেলেন, পথ হারালেন তিনি, সকল পথ, ফেরার পথ, পিছন পথ হারিয়ে গেছে বৈদ্যরাজের।

যাকে যার প্রয়োজনে লাগে—বৃদ্ধারমনীর বেশ ধরে মা তাকে দেখা দিলেন। বললেন, আমার ছেলের বড়ো ব্যামো।

—কোথায় তোমার ছেলে? এই গভীর জঙ্গলে কোথায় তুমি থাক মা?—জিজ্ঞাসা করলেন বৈদ্যরাজ।

—এসো দেখাচ্ছি—মন্দিরের কাছে টেনে আনলেন বৈদ্যরাজকে। যাতনায় ছট্ ফট্ করছে মন্দির আশ্রিত এক মাতৃভক্ত সন্ন্যাসী। গুপ্ত ওষুধের সন্ধান বলে দিলেন বৃদ্ধা। বল্‌লেন—রেখে দে তোর কাছে, সর্ব্ব রোগের এক ওষুধ দিলাম তোকে, খাইয়ে দে আমার সন্ন্যাসী ছেলেকে। মা হয়ে'ত আমি আর নিজে হাতে ছেলেকে ওষুধ খাওয়াতে পারি না। ও বিষ যে আমার হাতে এসে অমৃত হয়ে যায়। ওষুধের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় সাথে সাথে।

ওষুধ পেয়ে সন্ন্যাসী নিরাময় হয়ে উঠলেন, মা-ও মন্দির মাঝে মিলিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

স্নানের পূর্বে তেলমাখার পর এক ছিলিম তামাক খাওয়া যেমন আমার অভ্যাস,—সন্ধ্যার পর আমার কাছটিতে বসে বউমায়ের গল্প শোনা তেমন একটা অভ্যাস। তিনি বুকের জ্বালা জুড়াতে এসে বসতেন আমার কাছে।

বউমা যদি এমন করে গল্প শুনতে না চাইতেন, তবে বোধ হয় এগুলো আমার স্মৃতি কোঠায় শুখিয়ে যেত।

যেবার আমার প্রথম সন্তান আশিসের জন্ম হয়—সে বছর ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক হোলো। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরেও তাঁর নামে বেশ ঘটা হলো সেদিন। পুজো দিলেন কলকাতার উত্তর অঞ্চলের দু'একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সম্রাটের নামে পুজো দিলেন তারা কিন্তু, সে পুজো দেখলেন কে? দেখলেন, সম্রাটের প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন এদেশে, তারাই দেখলেন সেদিনের তোষামোদ আর ঐশ্বর্য্যের বাড়াবাড়ি—সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা করে মিত্তির মশাই খরচা করলেন কয়েক হাজার টাকা। বিদেশী প্রতিনিধিরা লম্বা রিপোর্ট লিখে পাঠালেন সেদিনের পুজোর বিবরণ দিয়ে।—যেমন পুজো তেমন দক্ষিণা। দক্ষিণা পেলেন আমার শ্বশুর মশাই।

কিছুকাল বাদে সেই প্রসিদ্ধ মিত্তির মশাই এলেন আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছে। সুদৃশ্য একটা মোড়ক খুল্‌তে খুল্‌তে হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। সম্রাট তাঁকে ধন্যবাদ-পত্র পাঠিয়েছেন—যজমানের সাথে পুরোহিতের নামও যুক্ত হয়েছে সে ধন্যবাদ-পত্রের মধ্যে। সেই পত্রের একখানা নকল এনেছেন বাবুটি, সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে। শ্বশুর মশাইয়ের বৈঠকখানার ঘরে আজও সেই ধন্যবাদ পত্র ঝোলানো আছে। নতুন যজমান এলেই দেখান সেখানা, তিনি সে লিখিত ধন্যবাদের ব্যাখ্যাও শোনান সকলকে।

কালীঘাটে যে বারে এলাম দিদিমাকে সাথী করে, তাঁকে কালী দর্শন করাতে, তখন আমার বয়স কতইবা হবে! বিশ বাইশ বৎসর হবে আর কি। কালীঘাটে স্থায়ী বাসিন্দা হলাম সেবছর থেকেই। যে বছর আশিসের জন্ম হোলো, তার পরের বছর গড়লাম এই 'আনন্দমহল'। রাজতীর্থের স্থায়ী প্রজা হলাম আমি।

আশিস বড় হোলো। লেখাপড়া শিখে মানুষ হোলো। জ্ঞানে গুণে আমার মুখ উজ্জ্বল করে দিল—বুক ভরে দিল সে। তার মা নিয়তই এই কামনা করেছিলেন কাত্যায়নীর শ্রীচরণে।

মায়ের আশীর্ব্বাদে আশিস আজ ডাক্তার হয়েছে মানুষের দেহের রোগ সারাতে—কিন্তু মনের রোগ সারাতে পারে না সে। বউমায়ের বুকের জ্বালা নেবাতে পারেনি। তার একমাত্র বংশধর ব্রজগোপালকে ফেরাতে পারেনি নোঙ্‌রা পথ থেকে।

কতটুকু জানে তার নিজের ছেলেকে—? কী করেছে তার জন্য? তার নিজের অসাবধানতার জন্য ব্রজর আজ অধঃপতন।

এত তাড়াতাড়ি যে আশিসের পরিবর্তন হবে তা' স্বপ্নেও চিন্তা করিনি কখনও। বিদেশী শিক্ষার কি এত মহিমা! সে শিক্ষা কি নিজের সত্তাকে, সংস্কারকে বিসর্জ্জন দিতে বলে? বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে যেতে চায় সে, নিজের জন্মভূমিকে নিজের জননীকে প্রণাম করে না পাষণ্ড—দেব দ্বিজ ভুলে ম্লেচ্ছ হয়েছে হতভাগা! আমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলে, নাস্তিকবাদ বোঝাতে চেষ্টা করে আমাকে।

গল্প বলতে বসে আক্ষেপের উচ্ছ্বাসটা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেদিন। বউমা আমার পাশে বসে একটা দীর্ঘ চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলেন—বাবা, বোধ হয় আপনার শরীরটা ঠিক নেই, গল্প বলা আজ থাক। বরঞ্চ আমিই বলি, আপনি বিশ্রাম করুন।

বউমা বল্‌লেন—এক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমদিকে আমি বধূরূপে এলাম এবাড়ীতে। সে বার কি একটা তিথি উপলক্ষ করে কালীঘাটে অসংখ্য

লোকের সমাবেশ হয়েছিল। এত লোকের একত্র সমাবেশ কালীঘাটে এর আগে দেখিনি কখনও। তাঁরা এসেছিলেন কালীঘাটে কালীদর্শন আর গঙ্গার স্নান করতে। যাত্রীনিবাস, হালদার মশাইয়ের বাড়ী, পাণ্ডাদের বাড়ী আত্মীয়-স্বজন আর যজমানে ভরে গিয়েছিল সেবার। লোকে লোকারণ্য,—যত লোক তত পয়সা। মাকে কেন্দ্র করে যাদের জীবিকা তারা পয়সা উপায় করলো দু'হাতে। আপনিও এবাড়ীতে বহু অতিথি বরণ করেছিলেন সেবার। আমাকে বলেছিলেন—মা অন্নপূর্ণা এসে অন্নছত্র খুলেছে। সেই বছর চৈত্রমাসের মাঝামাঝি আপনার ছেলে সৈন্যবিভাগে যোগদান করলেন দেশরক্ষা করতে।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ মা। খোকা যুদ্ধে গিয়ে ক্যাপ্‌টেন হোলো, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল হোলো—কত দেশ-বিদেশ ঘুরে সাত বছর পর যখন সে বাড়ী ফিরল তখন তোমার ব্রজর বয়স কত বউমা ?

—তা' প্রায় সাড়ে ছ'বছর হবে বোধ হয়, বাবা।

তবে ?—ভূমিষ্ট হয়ে সাড়ে'ছ বছর বাদে ব্রজ দর্শন করল তার পিতাকে। আশিস বাড়ী ফির'ল নতুন রূপ নিয়ে যেমন তার চেহারার পরিবর্ত্তন, তেমন স্বভাব চরিত্রের। তোমার সাথে তার দ্বন্দ্ব সুরু হোলো, ধর্ম্ম দ্বন্দ্ব ; এই ধর্ম্মদ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে ব্রজর আজ অধঃপতন। কি বল বউমা ঠিক বলছিনা ? ··আশিস পাপ করেছে, মহাপাপী সে। নিজ ধর্ম্মে, বাপ পিতামহর ধর্ম্মে কুৎসা রটায় সে, অন্য ধর্ম্মকে প্রসংসা করতে বসে। যে আপন জনক জননীকে শ্রদ্ধা করে না···

বউমা বাধা দিলেন আমাকে। তিনি এ প্রসঙ্গ চাপা দিতেই বোধ করি রাখালকে ডেকে গড়গড়ার কল্‌কে পালটে দেবার হুকুম করলেন। বললেন,—বাবা আপনি তামাক টানুন, আমি বলি।

বউমা বললেন,—সেবারে আপনি অসুস্থ, আপনার ছেলে বিদেশে। মা'ত সারাদিন আধপাগলের মত বাড়ী আর কালী-বাড়ী করছেন। ব্রজর বয়স তখন আঠারো-আমার বাবাও গত হয়েছেন সে বছর। আমার বড় দাদা সতীনাথ আসতেন আপনার অসুখের খোঁজ খবর

নিতে। হাতে করে আনতেন মায়ের প্রসাদী নির্ম্মাল্য। সেগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে, বলতেন—দে, পাঁচসিকে পয়সা দে ; মায়ের পুজো দিয়ে দেব। আমি জানতাম দাদা সে পয়সা নিয়ে কোথায় পুজো দিতেন, কার সেবায় ব্যয় হোতো সে পয়সা।

দাদার অবস্থা দেখে আমার যেমন ভয় হোতো, তেমন দুঃখও পেতাম মনে মনে। সতত তাঁর ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্য ব্রজকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখতাম। দাদা ছিনিয়ে নিয়ে যেতেন ব্রজকে। বলতেন—তোর ব্রজর চেহারা ঠিক ব্রজের গোপালের মত। আমার এক গয়লানী যজমান ভারি ভালবাসে ওকে—দেখলেই টিপ্ টিপ্ করে প্রণাম করে দু'টাকা প্রণামী দিয়ে।...এসব ব্যাপারে আমার আপত্তি থাকলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতাম না স্পষ্ট করে।

ভবানীপুরের মহিম চাটুজ্যের ছেলে মদন আসত আমাদের বাড়ী পান চিবুতে চিবুতে। ব্রজর সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। একদিন মদন এসে হাজির হোলো একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে, তাকে মাসী বলে পরিচয় দিল সে। বছর চল্লিশেক বয়স হবে বিধবা স্ত্রীলোকটির। মোটাসোটা কালো চেহারা, নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠির মালা। গায়ে একখানা মটকার চাদর জড়ানো।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসলেন রকের ঐ খানটাতে। হাঁপ ছেড়ে বললেন—বাবাঃ, একটুখানি পথ ? কোথায় পাথুরে ঘাট আর কোথায় কালীঘাট—এ মুল্লুক আর সে মুল্লুক। কাল রাত্রে যখন শুনলাম মদনের কাছে—তখনই'ত রাগে আমার গা' রী-রী করে উঠলো। তারপর সামলে নিলাম নিজেকে ; ভাবলুম ভদ্রলোকের বাড়ী রাত্রে গিয়ে হুজ্জুতি করব না। কথার মাঝে কোন রকম দম না নিয়ে ডাকতে লাগলেন আমাকে।—কৈ গো দিদি ব্রজর মা কোথায় গো—? বিনা ভূমিকায় কথাগুলো বলতে বলতে চোখ ঘোরালেন বাড়ীর চারিদিকে। পানের ডিবে বার করে গোটাচারেক পানের খিলি মুখে ভরে

দিয়ে গোটাদুই এগিয়ে দিলেন মদনের হাতে। তারপর বল্লেন—হ্যাঁগো দিদি, তুমিই'ত ব্রজর মা? মদন চিনিয়ে দিল আমাকে।

মুখখানা বেঁকিয়ে বললো স্ত্রীলোকটি,—হ্যাঁগো ছেলের মা, ছেলের পা'য়ে বেড়ী দিতে পার না?

—কেন কি হয়েছে? অবাক হয়ে গেলাম আমি।

—হবে আর কি? ছাড়াগরু যার তার ঘরে ঢুকে পড়ে যে। আমার মেয়ে চাঁপাকে তোমার ছেলে······কি গো মদন বলনা সব খুলে।

—দোহাই তোমাদের আর শুনতে চাই না—অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম আমি।

আমি তখন কোথায় ছিলাম বউমা?

—আপনি তখন নবদ্বীপে যজমান বাড়ী গিয়েছিলেন, বাবা।

বউমায়ের কথাগুলো কেঁপে কেঁপে বার হচ্ছিল তাঁর কণ্ঠের ভেতর দিয়ে। জোর করে ঢোঁক গিলে বললেন,—সেই দিন ঐ স্ত্রীলোকটি পাঁচ'শ টাকা গুণে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। হয় ব্রজর সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, না হয়, টাকাগুলো দিতে হবে।—তাই দিলাম গুণে গুণে।

টাকা নিতে এসেছিল সে, টাকা নিয়ে চলে গেল। বলে গেল—বিয়েটা হলে ছোট্‌ঠাকুরের লাভ হোতো কিছু।

ছোট্‌ঠাকুরের নাম করতে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ছোট ঠাকুর মানে আমার দাদা সতীনাথ। এদের সাথেই বেশী ঘনিষ্ঠতা তাঁর।

এই পর্য্যন্ত বলে বউমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। চোখে কাপড় চাপা দিয়ে ঝড়ের বেগটা বন্ধ করে দিলেন কোন রকম। তার বুকের ভেতরটায় যে ঝড় দাপাদাপি সুরু করে ছিল—সে আর বার হতে পারল না।

অহোরাত্র বউমায়ের বুকের ভেতর সে আগুণ জ্বলছে। ঝড় বইছে ওলোট-পালট করে। জ্বলে পুড়ে আঙার হয়ে গেল সব কিছু।

এ জ্বালার কি ওষুধ আছে? কিসের প্রলেপে জুড়বে সে জ্বালা! অহোরাত্র তারই চিন্তা বউমায়ের। তাইত তিনি স্মরণ করেন চিন্তাময়ীকে—আমার দুশ্চিন্তা দূর কর গো চিন্তামনি, মনের কালী ঘোঁচাও মা কালী।

সবই তাঁর ইচ্ছা। চিন্তামণি কখনও চিন্তা দান করেন, আবার কখনও চিন্তা হরণ করেন তিনি। তিনিই সব। তিনিই কাজ করান, আবার তিনিই কাজের বিচার করেন। বিশ্বাস হারিয়ে ফেল না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।

আমার শ্বশুর মশাইয়ের ডান পা'খানা বাত রসে যখন প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল, তখন সতীশ কবিরাজের কেরামতি দেখলে'ত? বেতো-পায়ের মাংসল স্থানে মস্তবড় ক্ষত বানিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,—এই ক্ষত শুখবার সাথে সাথে বেতো পা'ও কাজের পা'হয়ে যাবে—পায়ের বাত রস শুখিয়ে যাবে। কিছুকাল বাদে হোলোও তাই। ক্ষতস্থান শুখবার সাথে সাথে বাতরসও শুখিয়ে গেল।

কিসের কারণে যে কী তা কি সবাই বোঝে? সে দিন সতীশ কবিরাজের ব্যবস্থা কি আমরা প্রসন্ন মনে মেনে নিয়েছিলাম? শুধু তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসে তাঁকে সবাই মান'ত শ্রদ্ধা কর'ত। তিনি যা কিছু করেন রুগীর কল্যাণের জন্য।

মায়ের সব কিছুই যে কল্যাণমূলক। তাঁর শাসন অনুশাসন না মেনে কি আমরা চলতে পারি? তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে কি উপায় আছে?

॥ ছয় ॥

যাকে যার কাজে লাগে—সে ই তখন খোঁজ করে তার কাজের লোকটিকে।

সপ্তগ্রামের শ্রীকান্ত ঘোষের বাড়ীতে একজন অতিথি এলেন। যেমন তার বয়স,—তেমন তার গুণ। কুলশীল দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘোষমশাই সেই অতিথির হাতে সম্প্রদান করলেন নিজের কন্যাকে। অতিথিকে জামাতারূপে বরণ করেই তিনি যে ক্ষ্যান্ত হলেন, তা নয়—নিঃসম্বল জামাতা বাবাজীকে সপ্তগ্রাম সরকারী দপ্তরখানায় হিসাব রক্ষকের এক চাক্‌রী জুটিয়ে দিলেন ঘোষমশাই।

এই অতিথিই মহারাজা প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ। ভবানন্দ রায়ের পিতা।

অমৃত মন্থনে প্রতাপ উঠে এলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে'ত আর কালীঘাটের কাহিনী বলা যায় না—তা'হলে যে অঙ্গহানি হবে।

কালী আর কালীমন্দিরের কথা জানতে হলে এঁকেও জানতে হবে…

হ্যাঁ, যা বলছিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে রামচন্দ্রের যথেষ্ট সুনাম বেড়ে চল্‌ল দিনে দিনে। কিন্তু একদিন তার বিপর্য্যয় ঘটল। এক পাঠান শাসনকর্ত্তার সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ হোলো—হোলো'ত হোলো—শেষপর্য্যন্ত চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে এলেন।

—এলেন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে। সেখানে তখন মহা বিপ্লব। সেই বিপ্লবের দিনে বাংলার সিংহাসন অধিকার করে বসেছিলেন—সুলেমান-ই কারসানী হজরৎ। মহাবিপদের দিনে রামচন্দ্রের মত কর্ম্মঠ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী পেয়ে সুলেমান উপকৃত হলেন। কিছু জায়গা জমি দিয়ে রাজধানীতে রামচন্দ্রের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন সুলেমান স্বয়ং।—সে সব ষষ্ঠ দশ শতাব্দীর কথা।

ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁকে কৃপা করেন—তাঁর গুণপনা, কর্ম্মশক্তির প্রখরতা প্রকাশ হয় সূর্য্য কিরণের মত।

হোলোও তাই। রামচন্দ্রের ভাগ্য চক্র ঘুরেচে—সপ্তগ্রামের পাট চুকিয়ে ছেলেপুলে নাতি-পুতি নিয়ে গৌড়রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হলেন তিনি। তখন তাঁর ভরা সংসার। তিন পুত্র—ভবানন্দ,—শিবানন্দ,—আর গুণানন্দ। দুই শিশু পৌত্র,—ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি আর শিবানন্দের পুত্র জানকী বল্লভ। দুই পৌত্রই সুলেমানের শিশু পুত্র দাউদের সমবয়সী। তিনজনে ভারী ভাব। খেলাধুলা, পড়াশুনা, যুদ্ধবিদ্যা সবই এক সাথে। গভীর বন্ধুত্ব তাদের।

সময় মত দাউদ একদিন সিংহাসনে বসলেন। আবাল্য বন্ধুত্বর কথা স্মরণ করে দুই বন্ধু শ্রীহরি আর জানকীবল্লভকে প্রধান দুই অমাত্যের পদে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা শুধু চাকরীই পেলেন না—দুই রাজ-উপাধী পেলেন দাউদ খাঁয়ের কাছ থেকে। শ্রীহরি হলেন রাজা বিক্রমাদিত্য আর জানকী বল্লভ হলেন রাজা বসন্ত রায়।

—রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য। খেলাধুলার সাথে সাথে কিছু রাজনীতিও শিখ্লেন তিনি। তারপর একদিন ঘটনাক্রমে তিনি হাজির হলেন সম্রাট আকবরের দরবারে। তখন তাঁর যৌবন বয়স।

সম্রাটের সভায় এক সমস্যাপূরণ প্রতিযোগিতা চলছে তখন—অনেকে পিছিয়ে গেছেন সেই প্রতিযোগিতায়। প্রতাপ সুযোগ পেলেন তাতে যোগ দেবার—সমস্যা পূরণ করে জয়ী হলেন প্রতাপাদিত্য। সম্রাট আকবরের সু-নজর পড়ল তাঁর প্রতি—তিনি সম্রাটের প্রীতিভাজন হলেন। পরিচিত হলেন অনেক জ্ঞানী-গুণী বীরযোদ্ধার সাথে। কুমার সেলিম, বীরবল, টোডরমল, মানসিংহ, ফৈজী, অবুল ফজল আরো কত সব।

একদিন স্বদেশে ফিরলেন প্রতাপাদিত্য। সঙ্গে আনলেন সম্রাট আকবরের ফারমান। জমিদারীর কাগজ-পত্র থেকে পিতার নাম

খারিজ করে পুত্রের নাম লিখে দিলেন সম্রাট স্বয়ং। তিনি কি আর লিখলেন? তাঁকে দিয়ে লেখালেন প্রতাপাদিত্য—তিনি সম্রাটকে যেমন বোঝালেন, সম্রাট তেমন বুঝলেন।

ভাগ্য যাকে সাহায্য করে—তার হাতের মুঠো সোনায় ভরে যায়। কর্ম্মঠ অধ্যবসায়ী পুরুষকারকেই ভাগ্য সাহায্য করে।

যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে বসলেন প্রতাপ। হাসি মুখে নেমে এলেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসন থেকে। খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় সমাজ ব্যবস্থা আর বৈষ্ণব সঙ্গ নিয়ে আনন্দ মুখরিত হয়ে রইলেন তাদের পাশে।

যশোহর রাজ্য নবরূপ ধারণ করল। লোকজন ধনদৌলতে দেশ ভরে উঠলো কানায় কানায়। যেন পরশ মনি খুঁজে পেলেন প্রতাপ—পরশ মনি হয়ে জেগে উঠলেন আদ্যাশক্তি মা মহামায়া—যশোরেশ্বরী হয়ে ধরা দিলেন তিনি প্রতাপের হাতে।

সে যুগেরও বহু পূর্ব থেকে আদ্যাশক্তি মা জননী করালিনী মূর্তি ধারণ করে দক্ষিণাকালী হয়ে বসে আছেন কালীক্ষেত্রের জঙ্গলে। রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বের কিছু পূর্ব থেকে। লোক চক্ষুর অন্তরালে মা বসে ছিলেন গভীর জঙ্গলে—জগতের কল্যানার্থে। পূজা নিতেন কয়েকজন কাপালিক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে।

রাজা প্রতাপাদিত্য সে জঙ্গল কেটেকুটে লোকালয় গড়ে তুল্‌লেন। মা প্রকাশ হলেন দেশের ও দশের কাছে।

এই সময় মায়ের লীলাভূমি কালীক্ষেত্রের কথা, কাহিনী কিছু লিখিত হোলো ঐতিহাসিকের পাতায়—সে ফিরিস্তি দেবেন ঐতিহাসিকেরা। আমি গল্পকার—গল্প বলি।

যশোহর রাজ্যের সীমা তখন, উত্তরে—নদীয়ার অধিকাংশ এবং চব্বিশ-পরগনার উত্তরাংশ,—দক্ষিণে-সমুদ্র, পূর্ব্বে মধুমতী—পশ্চিমে ভাগীরথী। এই বিশাল ভূভাগকে দশ আনা ছ'আনায় ভাগ করলেন রাজা বিক্রমাদিত্য—প্রতাপের মতি গতি দেখে। ছ'আনা রাজা বসন্ত রায়ের—দশ আনা প্রতাপের।

বসন্ত রায়ের রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল কালীক্ষেত্র ভূমি। সে সব বহুকালের কথা। যতদিন জীবন ধারণ করে আমার পূর্ব্বপুরুষরা এসকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—যেমন বিন্যাস করে সকল কাহিনী আমাদের শুনিয়েছিলেন, তেমন করে কি আমার বলা হবে!

বলার সে ধৈর্য্যও নেই—আর মনও নেই। সব মনটা জুড়ে বসে আছে ব্রজগোপাল। ব্রজকে যদি নোংরা পথ থেকে ফেরাতে পারতেন বউমা,—তাহলে আমার জীবনের শেষকটাদিন শান্তিতে কাটাতে পারতাম। বউমাও শান্তি পেতেন।

তিনি দিবানিশি ডাকেন সেই ব্রহ্মময়ীকে—। গভীর কাতর প্রার্থনা করেন সংসারে থেকেই—সকল কর্ম্মের মাঝে থেকে।—আমার ব্রজকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে দাও মা, তাকে সুমতি দাও।

॥ সাত ॥

একান্ত কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন মা। অন্তর যেদিন কাঁদবে সেইদিনই হোলো প্রকৃত কান্না ; এ'কান্নার ভাষা আর কেউ না বুঝুক, মা বোঝেন। এমনি কান্না কেঁদেছিলেন, এমনই কাতর ভাবে ডেকেছিলেন আত্মারাম ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মময়ী মা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সময় মত। তাঁর ডাকেই তিনি আবির্ভূ'তা হয়েছিলেন সমুদ্রতটের এই জঙ্গলে। দক্ষিণাকালীর রূপ ধারণ করেছেন সেই তখনই।—

গঙ্গার কূলে ভীষণ জঙ্গল—সুন্দরীগাছের প্রাচুর্য্য সেখানে, জঙ্গলের নাম সুন্দরবন। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।

শুধু কি সুন্দরীগাছ—দেবদারু, বট, অশ্বত্থ, বেল, আমলকী গাছ-গুলো দাঁড়িয়ে আছে আপন জনের মত—গায়ে গা' লাগিয়ে। মাঝে মাঝে আছে বাঁশ ঝাড়, হোগ্‌লা বন, বেত বন, লতাপাতা কত সব গাছ গাছ্‌ড়া। খানা খন্দ, ডোবা, পুকুর আছে মাঝে মাঝে।

গঙ্গায় জোয়ার এলেই দু'কূল ছাপিয়ে জল উপ্‌ছে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের মাঝে। খানা খন্দে জল জমে থাকে, পাতা পচে, হোগ্‌লা পচে, ভ্যাপসা গন্ধ ছড়ায় জঙ্গলময়। আনাচে কানাচে মানুষের কঙ্কালের খণ্ড অংশ, আর মাথার খুলি।

খড় মাটি দিয়ে গড়া কালী মূর্তি নিয়ে সাধনা করে কালীসাধকেরা, বীরাচারী কাপালিক সন্ন্যাসীরা শব সাধনা করে—মানুষের শব দেহের উপর বসে। বেল কাঠ পুড়িয়ে হোম করে—যোগ সাধনা করে নির্জ্জন বনে বসে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। দিনমানে রাত্রের নির্জ্জনতা। রাত্রে শোনা যায় শকুনী আর শৃগাল দম্পতির চিৎকার। মাঝে মাঝে নরবলি দেওয়ার উন্মত্ত উল্লাস আসে কাপালিকের কণ্ঠ হতে—করুণ আর্তনাদ আর গোঁগানি শব্দ।

শিবনেত্র হয়ে বসে ধ্যান করেন সন্ন্যাসীরা। অদ্ভুৎ তাদের যোগ সাধনের রীতি। শীর্ণ দেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ—উর্ধ্ববাহু হয়ে বসে থাকেন দিনের পর দিন।—কেউবা দেহের সম্পূর্ণ ভার রাখেন মস্তকের উপর,—পা'দুখানা উর্ধ্ব মুখে তুলে। আত্মনিপীড়ন ছিল সন্ন্যাসীদের-সাধনার কৌশল। যোগ সাধনা করে তারা সিদ্ধ পুরুষ হবেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সকল ইন্দ্রিয় জয় করবেন সন্ন্যাসীরা।

আত্মরাম ব্রহ্মচারী এসেছেন এই জঙ্গলের মাঝে—শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী তিনি। ব্রহ্মময়ীকে সাধনা করবেন এই বিপদ সঙ্কুল বনে বসে।

পৌরানিক যুগে এই স্থানে বসেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করে অভীষ্ট ফল লাভ করেছিলেন। গঙ্গার উপকূলে এই স্থানেই দেবাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল। আত্মারাম এই স্থান খুঁজে বার করলেন—এই স্থানে বসে কালী সাধনা করবেন ঠিক করলেন।

মস্তবড় পুষ্করিণী—হ্রদের মত দেখায় সেটা। এরই পাশে বিরাট পঞ্চবটী গাছ। সেই গাছের ডালে আঁকশীর মত পা' আটকে মাথা ঝুলিয়ে রেখেছে নীচের দিকে। মাথার নীচে অগ্নিকুণ্ড; অগ্নির সম্পূর্ণ তাপ লাগছে সাধকের সারা দেহে—পঞ্চতপা সাধনা করেছেন আত্মরাম ব্রহ্মচারী। এতেও তাঁর তৃপ্তি নেই। ধ্যানে বস্‌লেন তিনি শান্ত শিষ্ট হয়ে,—পঞ্চবটী তলায় পদ্মাসন হয়ে।

কতদিন কতরাত কেটে গেল—নড়াচড়া নেই আত্মারামের। একমাত্র কামনা—"মা দেখা দাও"—মায়ের দেখা পেলেই খুসী। আর কিছু চায় না সে।

বসে আছেন আত্মারাম ধ্যানস্থ হয়ে—পাথরের মূর্ত্তির মত। শুকিয়ে গেছে দেহটা—হাড়কখানা সম্বল হয়েছে তার। পাশ দিয়ে হিংস্র জন্তুগুলো আসাযাওয়া করে—এই কঙ্কাল সার দেহটার প্রতি তাদের কোন লোভ নেই—কি পাবে এই হাড়কখানা চিবিয়ে? শৃগাল দম্পতি

পাশ কাটিয়ে চলে যায়—ফিস্ ফিস্ করে শৃগালী বলে শৃগালকে—চুপ্ চুপ্ ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হবে। একটা বুনো পাখীও বোধ করি ডাকে না করুণা করে—পাছে আত্মারামের ধ্যান ভঙ্গ হয়।

—বাবা!

ছোট্ট একটি মেয়ে ডাকছে করুণা করে। সে আওয়াজ কর্ণ-কুহরের ভেতর দিয়ে একেবারে মরমে পৌঁছল আত্মারামের। আবার ডাকে—বাবা!

—ধ্যান ভঙ্গ হোলো সন্ন্যাসীর। চোখ চেয়ে দেখলেন—সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি মেয়ে। কী তার রূপ! কী তার দেহের ভঙ্গী। পরনে লালপেড়ে ডুরে শাড়ী;—মাথার চুলগুলি এলিয়ে দিয়েছে পিঠের উপর দিয়ে। ঘন অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোয় আলো হয়ে গেছে সে স্থানটুকু।

ব্রহ্মচারী বুঝতে পারলেন। যে বেশে মা থাকুক না কেন সন্তানের কি চিন্‌তে ভুল হয় কখনও? ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে ডাক্‌লেন—'মা মা' বলে। বহু পিপাসিত কণ্ঠে যেন দু'ঘটি জল ঢেলে দিলেন।

ছোট ছোট দু'খানি হাত নেড়ে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আধো-আদো স্বরে মা বললেন—তোর ধ্যানে আমি তুষ্ট হয়েছি আত্মারাম—তুই বর প্রার্থনা কর।

ধীরে ধীরে বিশ্বজননী আরো খানিক অগ্রসর হলেন—একান্ত কাছে গিয়ে বল্‌লেন—আমার আদেশ পালন করবি বাবা?

মায়ের ইচ্ছা তিনি যন্ত্র হয়ে বসেন। বেটা যন্ত্রী হয়ে তার ঝঙ্কার পৌঁছে দিক—দিকে দিকে। শান্তি প্রদায়িনী মা তাঁর শীতল হস্ত প্রসারিত করে সকল দুঃখের অবসান ঘটান। সন্তানেরা বুঝুক মায়ের স্নেহ। সকলের সব জ্বালা জুড়াতে তিনি আবির্ভূতা হবেন মর্ত্যধামে—প্রচারিত হোক মায়ের লীলা খেলা।

আত্মারামের মুখমণ্ডল প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। বিনয়-নম্র সুরে বল্‌লেন—আদেশ কর মা।

—মা বল্‌লেন—আমি বহুকাল ব্রহ্মানন্দ গিরির কঠোর তপস্যায় শিলারূপে বন্দিনী হয়ে রয়েছি—তুই সেখান থেকে আমাকে মুক্ত করে নিয়ে আয় আত্মারাম। নীলগিরি পর্বতে দক্ষিণপূর্ব কোণে আমি আছি।

মা আর বেটায় আলাপ হচ্ছে। একেবারে ঘরোয়া আলাপ। আত্মার সঙ্গে আত্মার,—ছায়ার সঙ্গে কায়ার।

মা বললেন—শোন বাবা,—তুই যে বেদীতে বসে আছিস্ ঐ বেদীতেই আমাকে বসাবি—করাল-বদনী রূপে আমি অধিষ্ঠান হব এখানে।

ব্রহ্মানন্দ গিরি। যোগীপুরুষ—ঈশ্বরের সাথে তার যোগাযোগের বাসনা। এক ক্ষেপা সন্ন্যাসী—মা মা করে ক্ষেপে উঠেছেন ব্রহ্মানন্দ। মায়ের সাধনায় গিরিগুহায় এসে হাজির হয়েছেন—চীৎকার করে ডাকেন—, মা কোথায় আছিস্ একবার দেখা দে মা। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করে বসেন অভিমানভরে—যদি তোর দেখা না পাই মা, তবে এদেহ নদীতে বিসর্জ্জন দেব—কি হবে এ দেহটা দিয়ে ?

উন্মত্ত উদ্দণ্ড ক্ষেপা সন্ন্যাসী। অবাধ্য দুষ্ট ছেলে—কি করতে কি করে বসবে ! ভক্তবৎসলা জননী কি আর থাকতে পারেন চুপ করে ! অবশেষে মা ব্রহ্মময়ী আবির্ভূতা হলেন ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে। সে আর এক ক্ষেপা মূর্তি। যেমন ক্ষেপা ছেলে—তেমন ক্ষেপা মা ; দু'ই সমান। বিশ্বগ্রাসী লোলজিহ্বা করাল-বদনারূপ মায়ের। বল্‌লেন,—ব্রহ্মানন্দ তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

কি চাইবে সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসী ! মায়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে ভীত হয়ে পড়েছেন ব্রহ্মানন্দ। যুক্ত করে নিবেদন করেন তিনি,—যদি কৃপা করে দেখা দিলি মা—তবে, শান্ত মূর্তি ধারণ কর—আমি দু'চোখ ভরে দেখি।

কুমারীরূপ গ্রহণ করলেন দেবী ভগবতী। এইবার চতুর ব্রহ্মানন্দ বর প্রার্থনা করলেন ভগবতীর কাছে—আমার সম্মুখে এই শিলাতেই অবস্থান কর মা, আমি যেন ইচ্ছা করলেই তোর দর্শন পাই।

সন্তান-বৎসলা বল্‌লেন—তথাস্তু। সন্তানের প্রেমে মা বন্দী হ'লেন।

মা আর সন্তান। সবই ত মায়ের ইচ্ছা। সেই ত চেতনা,—ধ্যান, জ্ঞান সবইত তিনি। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় নাশিনীর লীলাই'ত জগৎময়। ব্রহ্মানন্দের আনন্দ আর দেখে কে? মায়ের ভালবাসায় সন্তানের আনন্দ। মনের আনন্দে পূজার্চনা করেন—আর মা জগদম্বার শ্রীচরণ দর্শন করে তৃপ্তিলাভ করেন ব্রহ্মানন্দ।

একদিন আত্মারাম ব্রহ্মচারী এসে হাজির হলেন ব্রহ্মানন্দের কাছে। নদী-নালা পেরিয়ে—পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে আসতে হোলো তাঁকে।

—সে কি এলো? তাকে নিয়ে এলো চির চাঞ্চল্যময়ী—যার গরজ সে-ই নিয়ে এলো। দেখা হোলো ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আত্মারামের। ধ্যান ভঙ্গ করে চেয়ে দেখলেন সন্ন্যাসী। তাঁর কাছে সবিশেষ নিবেদন করলেন আত্মারাম। শুনালেন মায়ের মনোগত বাসনা।

মাকে নিতে এসেছে এক ছেলে—আর এক ছেলের কাছ থেকে। ছেড়ে দিতে কি মন চায়? ব্রহ্মানন্দ আবার ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যান করে জেনে নিলেন মায়ের অভিপ্রায়। শুন্‌তে পেলেন,—মা বলছেন, —আত্মারামের কথা বিশ্বাস করো—সে আমার আদেশ পালন কর্‌ছে —তার কথামত কাজ করলে আমি তুষ্ট হ'ব বৎস!—আমার কথা শোনো,—বেশীদিন এখানে থাকা উচিত নয়। এ'স্থান শীঘ্রই সমুদ্র-গর্ভে লীন হয়ে যাবে—বলে, মা জগৎ-তারিনী অন্তর্হিতা হলেন।

ব্রহ্মানন্দ আবার ধ্যানে বসেছেন। মাকে ছেড়ে দিতে মন আর চায় না কিছুতেই।—মিছামিছি কালক্ষয় করেন তিনি।...হঠাৎ দৈববাণী শ্রুত হোলো—'আর সময় নেই, তোমরা দুইজন সন্ন্যাসী

শীঘ্রই কালীহ্রদের নাম স্মরণ করে এই শিলা খণ্ডকে আঁকড়ে ধর। চক্ষু মুদ্রিত করে আমার নাম জপ কর—কোন ভয় নেই।'

ছুটে এলো ঝড় আর ঝঞ্ঝা—গর্জ্জে উঠলো বিরাট সমুদ্র। যেন লণ্ডভণ্ড করে দেবে সব। বনবিহঙ্গকুল ছুটোছুটি করে প্রাণ ভয়ে—অভয় দেন বরভয়দায়িনী মা জগদম্বা—ভয় নাই—ভয় নাই।

দুর্গতি-নাশিনীর স্তব পাঠ করে সন্ন্যাসীদ্বয় শিলাখণ্ডকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণ করে। চক্ষু মুদিত রইল তাদের। কতক্ষণ আর কত দিন তার হিসাব রাখে না কেউ। একদিন চোখ খুললেন—আত্মারাম আর ব্রহ্মানন্দ—দেখলেন, কালীহ্রদে তাঁরা পৌঁছে গেছেন। বিরাট হ্রদ। ঈষৎ ঘোলাটে জল। গঙ্গার সাথে তার যোগাযোগ। গঙ্গার সাথে সাথে হ্রদের জলেও জোয়ার ভাঁটা খেলে। বারো হাত লম্বা, দেড়হাত বেড় একখণ্ড কাল পাথর সমেত ভেসে এলো ব্রহ্মানন্দ আর আত্মারাম ব্রহ্মচারী এই হ্রদের জলে।

॥ আট ॥

পরম যত্ন সহকারে শিলাখণ্ডকে নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীদ্বয়—মা জগদ্ধাত্রী এই শিলাতেই আবদ্ধা আছেন। মা শিলা হয়েছেন,—শিলা আবার মা হবেন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

—তুমিত শিলা নও! তুমি যে জ্যোতির্ম্ময়ী,—বিদ্যুচ্ছটা ভুবন মোহিনী,—রাজ্যেশ্বরী তুমি। ত্রি-নয়ণী মাগো! ত্রিজগতে তোমার যে সমান দৃষ্টি,—সকলের কল্যাণ কামনাই যে তোমার অহোরাত্রের ব্রত—বিনীত স্তুতি মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, আত্মারাম আর ব্রহ্মানন্দ গিরি।

তাঁরা কল্পনা করছেন মায়ের সেই ত্রিনয়ন মুখখানি। সেই কল্পিত মূর্তি উৎকীর্ণ করালেন শিলাখণ্ডে। এ কাজে সন্ন্যাসীদ্বয়কে সাহায্য করছিলেন বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং। নিতান্ত প্রয়োজনে দেবতারা মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন মানুষের বেশে। মানুষ হয়ে এসেছিলেন বিশ্বকর্ম্মা। তিনিই অঙ্কন করে দিয়েছিলেন মায়ের ত্রিনয়ন-মূর্তি।

শিলাতে মা আবদ্ধা হয়েছেন ব্রহ্মানন্দের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে। সে বড় বিড়ম্বনা; চির চাঞ্চল্যময়ী কি আবদ্ধ থাকতে পারেন? ছল-চাতুরী করলেন ব্রহ্মানন্দর সঙ্গে।

ছলনাময়ী নারীর রূপ ধারণ করে একদিন উত্তেজিত করলেন ব্রহ্মানন্দকে—

ক্ষেপা সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ ক্ষেপা চীৎকারে দূর করে দিলেন তাকে,—তাঁর সম্মুখ হতে। বল্‌লেন,—ছলনা করতে এসেছ পাপীয়সি? চলে যাও আমার সম্মুখ হতে।

—মুক্ত হয়ে গেলেন মা প্রতিজ্ঞা বন্ধন হতে।

ব্রহ্মানন্দের বুক কেঁপে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গেই—তিনি বুঝলেন মায়ের ছলনা। কাঁদতে লাগলেন মাতৃহারা শিশুর মত।

কান্না যে কথা বলে। সে কথা বোঝে একমাত্র মা। মা ছাড়া ত্রি-জগতে সে কান্নার ভাষা আর কেউ বোঝে না। সন্তান যখন সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র মাতৃকোল কামনা করে, তখন তাকে কেউ থামাতে পারে না। মাতৃস্পর্শ পেলেই শিশু শান্ত হয়।

ব্রহ্মানন্দের কান্নায় মা প্রসন্না হলেন। বললেন,—দুঃখ করো না বৎস; তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন আছি। এই শিলাতেই আমি অনুভূতি দিলাম। শিলার স্পর্শেই আমার স্পর্শ অনুভব করবে—জগতে আমার পূজা প্রচার কর। এই শিলাখণ্ডকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে তুমি।

—মাথা ঠুকতে লাগলেন ব্রহ্মানন্দ সেই শিলার পাদদেশে।

সন্তান খুসী হয় মা বলে ডেকে, আর জননী খুসী হন মা ডাক শুনে। শতকোটি সন্তানের জননী যিনি, তিনি যে লক্ষকোটি মা ডাক শুন্‌তে চান। সে ডাক শুন্‌তে তাঁর বিরক্তি নেই। তিনি চান শাখাপ্রশাখা মেলে ফলে ফুলে পল্লবিত হয়ে বসে থাকেন। মা মা করে ডেকে শতকোটি সন্তান তাঁকে তুষ্ট করুক—তাঁকে নিবেদন করুক অন্তরের কথা। মনের কালী ঘোচাতে আসুক তারা মা কালীর কাছে।

মা ভাবছেন লোকালয় গড়বেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ঘনবসতি গড়ে উঠুক। সর্ব্বদেশীয় লোকের আনাগোনা সুরু হোক এখানে। তারা বুঝুক মায়ের কৃপা।

হুগলী জেলার গোঘাটা গোপালপুর গ্রামে বাস করেন সতী পদ্মাবতী। সাধক কামদেব গাঙ্গুলীর ধর্ম্মপত্নী তিনি। কত জন্ম ধরে কাঁদ্‌ছেন তিনি মা মা করে,—মাগো দয়া কর, কৃপা কর বলে।

সংসারে বসে সাধন ভজন করছিলেন সাধক দম্পতি। মা তাদের ডেকে এনে বসালেন ফকির-ডাঙ্গার মাঠে—তার একান্ত কাছে কালীকুণ্ডের পশ্চিমপাড়ে।

মতিগতি তাদের পাল্‌টে গেছে—কামদেব আর পদ্মাবতী সংসার বেশ ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তীর্থ বাস করতে এসেছেন জঙ্গলের মাঝে। ছোট্ট কুঁড়ে বেঁধে আছেন তারই মধ্যে। নিশ্চিন্ত মনে সাধন-ভজন করেন অহোরাত্র।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত,—বুনো জন্তুর দাপাদাপি আর চীৎকারে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠেন পদ্মাবতী। সারা রাত্র জেগে বসে আছেন তিনি, কামদেব যোগে বসেছেন।

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চেয়ে দেখছেন পদ্মাবতী কালীকুণ্ডের দিকে।—ও কিসের আলো! শত বিদ্যুতের ছটা বেরুচ্ছে এক জ্যোতির্মণ্ডল থেকে। দেখ, দেখ শীঘ্র চেয়ে দেখ,—স্বামীকে ডাকছেন পদ্মাবতী।

কামদেব তখন ধ্যানে মগ্ন,—পদ্মাবতী আবার ডাকলেন তাঁকে—কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে।—ও যে ডুবে গেল, ওযে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। শুন্‌ছ?—এবার স্পর্শ করলেন স্বামীর দেহ।

কামদেবের ধ্যান ভঙ্গ হোলো। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন স্ত্রীকে।—ঐ যে গো প্রভাত কিরণের মত আলোকিত হয়ে উঠলো হ্রদের পশ্চিম দিকটা—স্নিগ্ধ প্রখর রশ্মি। দেখতে পাচ্ছ না!

—কই কই কোন দিকে?

মিলিয়ে গেল—জলের সাথে আলো মিশে গেল।

ও কিসের আলো! কামদেব বুঝলেন মনে মনে। বেদনায় একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে রইলেন।

সতী-অঙ্গ-খণ্ড পড়েছিল বলেইত কুণ্ডের সৃষ্টি। মায়ের দক্ষিণ পদের চারিটি আঙ্গুল পড়েছিল ভূতলে। সেই তেজস্কর সতী-অঙ্গ পড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর বুক চিরে জল উঠে এলো পাতালপুরী থেকে। তাকে ঠাণ্ডা করলেন পাতালেশ্বরী।

মায়ের সেই তীব্র তেজস্কর পদাঙ্গুলী ভেসে উঠেছিল পাষাণ হয়ে—হাজার মাণিক্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই পাষাণ থেকে।

জঙ্গলের মাঝে থেকে সন্ন্যাসীরাও দেখেছিলেন সেদিনের—কুণ্ডের মাঝে আলোর জ্যোতি।

আর কি তাদের তর সয়? প্রভাত হ'তেই তুলে আনলেন ব্রহ্মানন্দ, সেই পাষাণ খণ্ডকে। তা' ওজনে প্রায় সাড়ে ছ'সের হবে! এক জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নানযাত্রার তিথিতে সে পাষাণখণ্ডকে তুলে এনেছিলেন সন্ন্যাসীরা। অদ্ভুত সুন্দর নিটোল নিখুঁত গড়ন—সতী অঙ্গ পাষাণ হয়ে গেছে মর্ত্যধামে পড়ে। শুকিয়ে চিম্‌সে গেছে রক্ত-শূন্য সতী-খণ্ড-অঙ্গ। তাকেই তুলে এনে সুগন্ধী তেল, চন্দন, মধু আর দুগ্ধ দিয়ে স্নান করালেন ব্রহ্মানন্দ। সেদিনের সেই পুণ্যতিথিকে স্মরণ করে আজও তাকে যত্ন সহকারে পুজো করেন মায়ের সেবাইতরা।

কামদেবের মনে ভীষণ দুঃখ। মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলির তীব্র জ্যোতি তাঁর আর দর্শন হোলো না। এই দুঃখই তাঁর বুক ভরা। দুঃখ ভরা মন নিয়ে বসেছেন যোগাসন হয়ে। স্বপ্নাবিষ্টের মত তাঁর চোখে মুখে বিহ্বলতার ছাপ—আব্‌ছা অস্পষ্ট মায়ের মূর্ত্তি দেখতে পেলেন তিনি।

মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন তার দুঃখিত ছেলেকে। বলছেন,—দুঃখ কোরো না বাবা! পরজন্মে আমার সাক্ষাৎ পাবে। আমার পরম ভক্ত ব্রহ্মানন্দ গিরির কাছে তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর—আমার এই কুণ্ডে স্নান কর ভক্তি সহকারে।—আমাকে কেন্দ্র করে যে নগর গ'ড়ে উঠবে, সেই নগরের আদিপুরুষকে পাঠাবো তোমাদের ঘরে। জেনে রাখ এই পুত্র হবে অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক—তার বংশধর থেকেহবে আমার পূজা প্রচার।

পদ্মাবতী গর্ভবতী হলেন—সংসারত্যাগী যোগিনী হয়ে। যথা সময় এক আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রসব করলেন মায়ের আদিষ্ট সন্তানকে। বর্ত্তমান কলিকাতার আদি পুরুষের জন্ম

হোলো সেদিন। লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে জন্ম বলেই পুত্রের নাম হোলো লক্ষ্মীকান্ত।

শিশু লক্ষ্মীকান্তকে রেখে পদ্মাবতী চলে গেলেন পদ্মালয়ে; মায়ের কোলে স্থান পেলেন তিনি।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর আবার সংসার বন্ধন কেন? মহাচিন্তায় পড়লেন কামদেব গাঙ্গুলী। স্ত্রী স্বর্গারোহণ করেছেন,—শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি কোথায় যান, কি করেন—এই তার গভীর চিন্তা।

যাঁর চিন্তা তিনিই করেন। মানুষ শুধু ভেবে ভেবে সারা হয়—কামদেব তাঁর শিশুসন্তানকে সঁপে দেন চিন্তামণির চরণে—তোমার চরণে জিম্মা করে দিলাম মা—তোমার জীব তুমিই দেখো।

মায়ের সেবক ব্রহ্মানন্দ গিরি আর আত্মারাম ব্রহ্মচারীর কাছে লক্ষ্মীকান্তকে রেখে, সংসার বন্ধন কাটিয়ে, মায়া ফাঁস ছিন্ন করে দেশত্যাগী হলেন কামদেব গাঙ্গুলী।

বিয়োগ ব্যথা ভুলতে চাইলেন কামদেব। পত্নী আর পুত্রকে রেখে গেলেন কালীক্ষেত্রের ভূমিতে। প্রাণপ্রিয় পত্নী চলে গেছেন ইহধাম হতে। প্রাণাধিক পুত্রকে ছেড়ে চল্লেন তিনি অমৃত সন্ধানে।

পদ্মাবতীর সমাধি ভূমিতে টিঁকে থাকতে পারলেন না কামদেব, আবার সাধন ভজন সুরু করে সব কিছু ভুলে থাক্‌তে চান তিনি। মায়া, মমতা, লোভ, কাম, পার্থিব সব কিছু ত্যাগ করে তিনি চল্‌লেন দেবাদিদেবের চরণে। মায়ের কাছ থেকে বাবার কাছে গেলেন তিনি।

মায়ের আকর্ষণে কিন্তু বাবা এসেছেন কালীঘাটে। মাতৃ অঙ্গ-খণ্ড যেখানে পড়েছে, সেখানেই দেবাদিদেব আছেন ভৈরব রূপ ধারণ করে। সতীর প্রতি শিবের আকর্ষণের চিরন্তন উদাহরণ হয়ে।

মায়ের মূর্তি প্রকাশ হোলো—কুণ্ডের ভেতর থেকে মায়ের পদাঙ্গুলী তুলে নিয়ে এলো সন্ন্যাসীরা।—এমন দিনে ও দিকে প্রকাশ হলেন মহেশ্বর।

চৈত্রমাসের এক প্রভাতে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী গেছেন জঙ্গলের মাঝে মায়ের পুজোর ফুল সংগ্রহ করতে—তখন দেখলেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। হৃষ্ট-পুষ্ট এক গাভী দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের মাঝে, সেই গাভীর স্তন হতে ক্ষরণ হচ্ছে দুগ্ধের ধারা! প্রাতঃকালীন সূর্য্য-রশ্মি এসে আলোকিত করেছে স্থানটুকু।

এমন ভাব, এমন দৃশ্য সন্ন্যাসী দেখেননি ত' কখনও! গভীর জঙ্গল, তার মাঝে এমন সুলক্ষণা গাই। ঘন অন্ধকার মাঝে প্রভাতী সূর্য্যের কিরণ;—বিহ্বল হলেন সন্ন্যাসী। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে তিনি দেখলেন সেই অপরূপ দৃশ্য। গাভীর স্তন হতে দুগ্ধ ক্ষরণ হচ্ছে অবিরাম ধারায়। গভীর খাদ্ সৃষ্টি হয়েছে সে দুগ্ধের ধারাতে। গাভী চলে গেল—অরণ্যের মাঝে মিলিয়ে গেল সে। আর তার সন্ধান পেলেন না সন্ন্যাসী।

গাভী চলে গেলে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেলেন সেই খাদের কাছে—দেখলেন দুগ্ধ পূর্ণ হয়েছে সে খাদ। তার মাঝে আছে ঘনকৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তর খণ্ড।

দেবলীলা। এ' দেবলীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্ন্যাসী ফিরে এলেন আশ্রমে; ধ্যানস্থ হয়ে জেনে নিলেন, কে তিনি।

ইনিই আদি অনাদি দেবাদিদেব। মহামায়া সতীকে রক্ষা করতে এসেছেন নকুলেশ্বর রূপে। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে এসেছেন পরম-পুরুষ। যেখানে সতী সেখানেই শিব। শিব-শক্তি একত্র হয়েছেন সকল পীঠস্থানে।

জনক জননী--শিব আর শিবানী। পিতৃ-মাতৃভূমি এ' কালীঘাট। সকল জীবের মোক্ষ হয় এখানে। তাই'ত সকল জীব ছুটে আসে এখানে মোক্ষ লাভের আশায়।

দেবাদিদেব নকুলেশ্বর প্রকাশ হলেন কালীক্ষেত্রে দক্ষিণাকালীর ভৈরব রূপে। সন্ন্যাসীরা মহা আনন্দে সেখানে মন্দির গড়লেন, বাঁশ খুটি পুঁতে, গোলপাতার ছাউনি দিয়ে।

মায়ের মন্দিরের পরিবর্তন হোলো মাঝে মাঝে, কিন্তু বাবা ভোলানাথের পর্ণ মন্দির রয়ে গেল বহুকাল। আপনভোলা বাবা নকুলেশ্বর বসে রইলেন পর্ণ মন্দির মাঝে। ঝড়জল, রোদবৃষ্টি সব কিছু সহ্য করে নিলেন বাবা নীলকণ্ঠ। কোনো কিছুই দুঃখের কারণ ঘটাতে পারে নি ভোলানাথের—কিন্তু দুঃখ পেলেন মা জগদ্ধাত্রী।

—এ কি কাণ্ড! তোমরা শুধু মাকেই চেন? পিতৃসেবা জান না? গুরুর গুরু পরম গুরু তিনি—দেবাদিদেব মহাদেব আমার স্বামী···মা বলছেন ভক্তজনের কাছে আক্ষেপ করে। বলছেন,—তোমরা আমাকে পূজো কর, নিবেদন কর দেহ মন, প্রনাম কর ভক্তি-যুক্ত মনে। কিন্তু আমি প্রণাম করি সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে।

পাঞ্জাব্ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ বণিক তারা সিং। তিনি চলেছেন পিতৃসেবা করতে—পিতৃভূমি কাশীধামে। বাবা বিশ্বনাথের মন্দির গড়বেন তিনি। সুন্দর মজবুত পাথর সংগ্রহ করে নৌকা বোঝাই করে চলেছেন পিতৃভক্ত তারা সিং কাশীধামের দিকে।

মা দেখ্ছেন বসে বসে—বলছেন,—যাস্ কোথায় বাপু! নৌকা ঘোরা এদিক পানে। চেয়ে দেখ নকুলেশ্বরের অবস্থা, কি অবস্থায় আছেন তিনি।

নৌকা ঘুরে এলো কাশীধাম থেকে কালীক্ষেত্রে। নকুলেশ্বরের পর্ণ মন্দির দেখলেন তারা সিং। তিনি সর্বপ্রথম নকুলেশ্বরের মন্দির গড়লেন আঠারো'শ চুয়ান্ন সালে। পর্ণ মন্দির প্রস্তর মন্দিরে পরিণত হলো। বাবা নকুলেশ্বরকে ঝড়জলের হাত থেকে বাঁচালেন পাঞ্জাবী বণিক তারা সিং।

পাথরের খিলান দিয়ে তৈরী বিদেশী স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে রইল এ মন্দির।

পরম তৃপ্তিতে, পরম ভক্তিতে মাতৃচরণে প্রণাম করে বললেন তারা সিং—এমন করে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিও মা জননী, আমাকে আদেশ কোরো, সৎ পথের নির্দ্দেশ দিও তোমার অবোধ সন্তানেরে।

॥ নয় ॥

কাশীধামে পৌঁছেছেন কামদেব। ধ্যানে-জ্ঞানে, সাধনে-ভজনে তিনি হয়েছেন অদ্বিতীয়।

গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে বসে তিনি যোগ অভ্যাস করেন।

নদীতীর ধরে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন এক রাজপুরুষ ;—তাঁর নজর ঘুরল সেই দিকে।—কে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী !—যিনি যোগাসন হয়ে ভূমি ছেড়ে শূন্যমার্গে বসে থাকতে পারেন ! কে তিনি ?

রাজপুরুষ এগিয়ে এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। তাঁর কাছে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। নিরীক্ষণ করলেন সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ।

কুম্ভক সাধনায় রত ছিলেন কামদেব। নিশ্বাস রোধ করে আপন দেহকে শূণ্যমার্গে টেনে তুলেছিলেন তিনি। কালীক্ষেত্র ছেড়ে এসেছেন কাশীক্ষেত্রে—এসেছেন নিভৃতে সাধনা করতে,—মাকে ছেড়ে বাবার কাছে।

মায়ের চরণে জমা দিয়ে এসেছেন তাঁর আপন পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে। মায়া-মমতা, লোভ-কাম, লজ্জা-ঘৃণা, সকল বন্ধন ছিন্ন করে এসেছেন তিনি। বারো বছরের সাধনায় কামদেব তুষ্ট করলেন—শিব আর শিবানীকে। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোলো এত দিনে।

রাজপুরুষটি কত দিন দেখেছেন এই শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীকে—মন তাঁর কত দিন উতলা হয়েছে ; কত দিন ভেবেছেন তিনি, যে মাথা নত করে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবেন এই সন্ন্যাসীকে। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছেন সন্ন্যাসীর প্রতি।

—ঠাকুর ! যুক্ত ক'রে, বিনীত কণ্ঠে ডাকছেন তিনি।

কোন সাড়াশব্দ নেই। স্তম্ভিত হয়ে গেছেন রাজপুরুষ। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলেন কয়েক প্রহর।

প্রাণায়াম সেরে সন্ন্যাসী যখন ভূমিস্পর্শ করে সুস্থ হয়ে বসলেন,—তখন শুনতে পেলেন কে যেন ডাকছেন বিনীত কণ্ঠে—ঠাকুর !

—কে,

—আমি রাজা মানসিংহ। সম্রাট আকবরের সৈন্যাধ্যক্ষ।

—কি তোমার অভিপ্রায়,—প্রশ্ন করলেন কামদেব সন্ন্যাসী।

দীক্ষা! তোমার কাছে দীক্ষা নিতে চাই ঠাকুর।

হিন্দু রাজপুত বিহারীমলের পৌত্র রাজা মানসিংহ। আকবর বাদসাহকে কন্যা উপহার দিয়ে পাঁচহাজারী পদে সম্মানিত হয়েছিলেন বিহারীমল। মানসিংহের পিতা ভগবান কন্যা দান করেছিলেন কুমার সলিমের হাতে। জামাই সলিমের কাছ থেকে তিনি উপাধি পেয়েছিলেন 'আমির-উল-ওমরা'—এবং পাঁচহাজারী সম্মানিত পদ।

লোভ। লোভে পড়ে মান-ইজ্জত বিসর্জ্জন দিয়ে মানসিংহের পিতা আর পিতামহ কামনা করেছিলেন ধনদৌলৎ আর রাজকীয় পুরস্কার।

—আর মানসিংহ?

তিনি কামনা করেছিলেন মান-ইজ্জত বজায় রাখতে—তাকে দৃঢ় করতে। একদিকে তাঁর পঞ্চদশশত স্ত্রীর সম্ভোগ আর একদিকে হিন্দু গুরুর পদসেবা। মহাবীর রাজা মানসিংহ বিরাট রাজকার্য্যে মাঝে থেকে প্রার্থনা করলেন গুরুপদ আর গুরু সেবা।

কামদেব সন্ন্যাসী রাজী হলেন রাজা মানসিংহকে দীক্ষা দিতে। মহাসমাদর করে আপন প্রাসাদে তাঁকে নিয়ে এলেন মানসিংহ; গুরু পদে বরণ করলেন যাগ্-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।

এদিকে কামদেব-পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে নিয়ে আত্মারাম ব্রহ্মচারী মহাসমস্যায় পড়লেন। একে শিশু তাতে আবার মাতৃহারা, পিতৃপরিত্যক্ত সন্তান। মাতৃস্তন্য ছাড়া তাকে বাঁচানো দায়।

মন্দির আশ্রমে আছে অনুগত ভৃত্য জগদানন্দ সর্দ্দার। মন্দিরের কাজ-কর্ম্ম, ফাই-ফরমাস্, হুকুম তামিল, সবদিকেই সমান দৃষ্টি জগদানন্দের। দু'হাত তফাতে ছোট কুঁড়েতে তার সংসারপাতা আছে।

বৃদ্ধ আত্মারাম সেই জগদানন্দ সর্দ্দারের হাতে শিশু-সন্তানের ভার অর্পণ করলেন।

সন্তান পেয়ে জগদানন্দ-পত্নী বুকে জড়িয়ে ধরে, তার মুখে দিল স্তনের ধারা। সন্তান মাতৃ অভাব ভুলে গেল। বুকের-দুধ পেয়ে শিশু লক্ষ্মীকান্ত বাড়তে লাগলেন দিনে দিনে।

আত্মারাম ব্রহ্মচারীর প্রধান শিষ্য আনন্দগিরির কাছে লক্ষ্মীকান্তর বিদ্যাভ্যাস সুরু হোলো সময় মত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ অধ্যায়ন করলেন তাঁর কাছে। লক্ষ্মীকান্তের সমবয়সী আর একটি সন্তান ছিলেন আশ্রম মণ্ডলে—তাঁর নাম,—ভুবনেশ্বর। একই সাথে অধ্যায়ন করেন দুটি শিশু আনন্দগিরির কাছে—আছেন একই আশ্রমে। জ্ঞানে-গুণে বিদ্যায় ও সৌন্দর্য্যে আশ্রমবাসীদের প্রিয় হয়ে উঠলেন লক্ষ্মীকান্ত। বয়স বৃদ্ধি পেয়ে, ছোট শিশু একদিন দ্বাদশ বৎসরে উপনীত হলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তান, উপনয়ণের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যায়—অথচ পিতার কোন সন্ধান মেলেনা। অবশেষে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ আত্মারাম লক্ষ্মীকান্তের উপনয়ণ ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন মায়ের মন্দিরেই। সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন লক্ষ্মীকান্তকে।

—তা তো হোলো। কিন্তু, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুত্র চাইলেন পিতৃ পরিচয়। পুত্রের মনে পিতৃ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা।

বৃদ্ধ আত্মারামের দেহ ক্ষীণ হয়ে আসছে! দেহ রাখবার তাঁর সময় হয়ে এসেছে। লক্ষ্মীকান্তের কোন উপায় করতে পারলেই তিনি যেন যেতে পারেন—এমন ভাব। মোহান্তের দায়িত্ব দিয়েছেন আনন্দ গিরির হাতে। তাঁর আর কোন দায়িত্ব নেই। যোগাসন হয়ে বসলেন আপন আসনে। একপ্রহর পরে ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি দেহ রাখলেন।

ওদিকে ধীর স্থির গুরুর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—কেন এমন হোলো?

রাজা মানসিংহ ভাবছেন সেই কথা। কেন গুরুর মন এত চঞ্চল? তাঁর কাছ থেকে'ত আর কোন আদেশ উপদেশ আসে না আজকাল! শলা-পরামর্শ করে রাজাকে হুঁসিয়ার করেন না তিনি!

সন্মানিত রাজকর্ম্মচারী তিনি। তিনি সম্মান করেন গুরুদেবকে রাজগুরুর মত। বিনীত কণ্ঠে শুধালেন তাঁকে,—কোন অসুবিধা বোধ করছেন কি গুরুদেব?

বারো বছর পর কামদেবের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠেছে। এযাবৎ কাল তিনি ছিলেন আচ্ছন্নের মত। ধ্যানে জ্ঞানে আর যোগ সাধনে ভুলে ছিলেন জগতের সব কিছু—ছিন্ন করেছিলেন বাহ্যিক যোগাযোগ। দীর্ঘ দিনের পর পুত্রের কথা মনে পড়েছে কামদেবের, তারই সন্ধানে মনটা ছুটোছুটি করছে চারিদিকে।

রাজা মানসিংহ জানতে পারলেন সে কথা। বল্‌লেন,—গুরুদেব আপনি সুস্থ হন; রাজকার্য্যে আমি বঙ্গদেশে যাচ্ছি—সেখানে পৌঁছে আপনার পুত্রের সন্ধান করব। নিশ্চিন্ত হ'ন গুরুদেব; আমি আপনার সকল চিন্তার ভার নিলাম।

॥ দশ ॥

রাজ্য মধ্যে তখন মহা বিপ্লব। সম্রাট আকবর মৃত্যু-শয্যায়। মোঘল সিংহাসন নিয়ে চলেছে টানাটানি। সম্রাটের তৃতীয়পুত্র সলিম পিতা বর্ত্তমানেই জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে চ'ড়ে বসলেন। ঘরের মাঝে তখন ঘোরতর বিবাদ—মন কষাকষি চলেছে নিজ পুত্র খসরুর সাথে। মাতুল মানসিংহ এবং শ্বশুর আজিম খাঁর ষড়যন্ত্রে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন খসরু।

কিন্তু করলে কি হবে ? সব জানাজানি হয়ে গেল।

খসরু বন্দী হলেন জাহাঙ্গীরের কাছে। বাদসাহ-পিতার হাতে নিহত হলেন তিনি।

আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আজিম খাঁ—আর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মহারাজা মানসিংহ। দুজনেই বিফল মনোরথ হয়ে পলায়ন করলেন,—গা'ঢাকা দিলেন বেশ কিছুকাল।

জাহাঙ্গীর ডেকে আনলেন তাদের—ও সব কথা ভুলে যান আপনারা, নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন ; সকল অপরাধ ক্ষমা করলাম আপনাদের।

এদিকে এই—ওদিকে বাংলা মুল্লুকে, প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্য শত্রুতা সুরু করেছেন মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাথে, বাদশাহের বার্ষিক কর বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু—মহাবিব্রত হয়ে পড়েছেন জাহাঙ্গীর। আপন শ্যালক মানসিংহকে সরাতে পারলে তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতেন। মানসিংহ সেনাপতি, বিশ হাজার সুশিক্ষিত রাজপুত সৈন্য আছে তাঁর হাতে। মনে মনে এক ফন্দি আঁটলেন,—এক চাল চাল্‌লেন জাহাঙ্গীর।

বাংলা দেশে প্রতাপাদিত্যকে দমনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবেন মানসিংহকে—ভাবলেন প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে যদি মানসিংহ নিহত হন, তবে ঘরের শত্রু মরবে—আর যদি প্রতাপ নিহত হন, তবে বাইরের শত্রু মরবে।

বড় অশান্তি। কোন শান্তি নেই রাজা মানসিংহের মনে। বার বার গুরুদেবকে প্রণাম করে শান্তি প্রার্থনা করলেন তিনি।

চঞ্চল মনকে শান্ত করতে হবে। গুরুর মন চঞ্চল, শিষ্যের মন চঞ্চল। বাসনা আর কামনায় চঞ্চল হয়েছে তাঁদের মন।

বাংলা দেশে এলেন রাজা মানসিংহ। প্রতাপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে; তার উদ্ধত মস্তক নুইয়ে দিতে হ'বে বাদশাহের চরণে। কিন্তু তার পূর্বে গুরুপুত্রের সন্ধান করতে হবে তাঁকে। গুরুই'ত ইষ্ট; তিনিই'ত ইষ্ট নাম ভরে দেন শিষ্যের কর্ণমূলে—গুরু তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট।

তাঁকে তুষ্ট করতে, তাঁর পুত্রের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু স্থানে খোঁজ করলেন রাজা মানসিংহ। খবর পাঠালেন বহুদিকে—সে সময় পাটলি অর্থাৎ বর্ত্তমান পাটনায় ছিলেন শূদ্রমণি নামে একজন জমিদার। তিনি সংবাদ নিয়ে এলেন রাজা মানসিংহের কাছে। বল্‌লেন—হ্যাঁ, আমি বলতে পারি তোমার গুরুপুত্রের সন্ধান। তিনি একবার সাগর যাবার পথে নেমে ছিলেন কালীক্ষেত্রের ভূমিতে, কালীর ঘাটে বজরা বেঁধে রেখে। মায়ের সম্মুখে পুজো দিয়েছিলেন মনের সাধ মিটিয়ে। নিরিবিলি নির্জ্জন স্থানের মন্দির মাঝে দেখেছিলেন আনন্দ-সমারোহ, সেদিনের কোলাহলের মাঝে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

—ব্যাপার কি?

উপনয়ন। দ্বাদশ বৎসরের এক শিশুর উপনয়ন অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেদিন। মায়ের মন্দির সম্মুখে বসে হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল শিশু ব্রহ্মচারী। আশ্রমবাসী অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী আলোচনা

করছিলেন সেই শিশুকে উপলক্ষ্য করে। সর্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত শিশুর এমন দশা কেন হোলো! বারো বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আজও তার পিতার সন্ধান মিল্‌ল না। শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন সেদিন আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা।

শিশুর নাম?

—নাম বোধ হয় লক্ষ্মীকান্ত হবে।

মিলে গেল। শূদ্রমণির কথাগুলো নিজের অন্তরের সাথে মিলিয়ে নিলেন রাজা মানসিংহ। সেখানে আমায় নিয়ে চল বন্ধু—আমার গুরুপুত্রের সন্ধান বলে তুমি যে উপকার করলে, তার কথা রাজা মানসিংহ কোন দিন বিস্মৃত হবে না। পুরস্কার,—আমি পুরস্কৃত করব তোমাকে—বলে, শূদ্রমণিকে আলিঙ্গনে-বন্দী করলেন।

তার পর মানসিংহ এলেন কালীক্ষেত্রে; কালীঘাট গ্রামে কালী-মন্দিরের সম্মুখে অগ্রসর হলেন তিনি—দেখা হোলো আনন্দগিরি আর ভুবনেশ্বরগিরির সাথে। সাদর অভ্যর্থনায় রাজা মানসিংহ আপ্যায়িত হলেন—আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের কাছে। মায়ের মন্দির সম্মুখে এসে হাজির হলেন রাজা। রাজ্যেশ্বরীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, যুক্তকরে বিনীত প্রার্থনা করলেন মনে মনে। বহুক্ষণ বসে রইলেন মন্দির চত্বরে। লক্ষ্মীকান্তের সাক্ষাৎ মিললো রাজাজীর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে।

সন্ন্যাসীরা ঘুরিয়ে দেখালেন রাজাজীকে মন্দিরে চতুর্দ্দিক—ঝোপ-জঙ্গল, গভীর বন ছাড়া আর কিছুই নয়। এলেন কালীকুণ্ডের তীরে—নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোষ করে কুণ্ডের জল তুলে নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দিলেন।

—গুরুদেবের আশ্রম কোথায় ছিল?—কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল লক্ষ্মীকান্ত? রাজা মানসিংহ প্রশ্ন করলেন আশ্রমবাসীদের কাছে। কুণ্ডের পশ্চিম তীর দেখালেন তাঁরা—কোন চিহ্ন নেই সেখানে। সে চিহ্ন রক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন নি কেউ। দুঃখিত হলেন রাজা মানসিংহ।

সন্ন্যাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করে সেদিন মায়ের প্রসাদী ফলমূল ভক্ষণ করলেন পরিতৃপ্ত হয়ে। সবই মায়ের লীলা—মনে মনে ভাবছেন রাজা মানসিংহ, কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম! গুরুর কথা স্মরণ হোলো তাঁর। রাজগুরু হয়ে রাজ-দক্ষিণা নেননি কামদেব গাঙ্গুলী —কি হবে ধন-দৌলৎ আর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে? সব কিছু ত্যাগ করেছেন তিনি—সন্ন্যাসী হয়ে। মাত্র পাঁচটি ফল দক্ষিণা নিয়েছিলেন গুরুদেব। লক্ষ্মীকান্ত তাঁরই সন্তান; মায়ের মানস-পুত্র সে। সেই পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মানসিংহ তাঁকে দান করলেন পাঁচটি পরগণা —মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান আর আনোয়ারপুর।

শুধু কি তাই? মায়ের সেবা আর পূজোর জন্য কালীঘাট গ্রামের চৌহদ্দি নির্ধারণ করলেন সাত'শ বিশ বিঘা জমি, সনদ লিখে দিয়ে। মায়ের মন্দির গড়ার দরুণ দিলেন পনের'শত স্বর্ণমুদ্রা। সব কিছু দিল্লীর বাদশাহের মোহর করিয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে, সনদের এক প্রস্থ পাঠিয়ে দিলেন মন্দিরের মোহান্ত আনন্দগিরির হাতে।

মায়ের ব্যবস্থা মা নিজে হাতেই করলেন। সন্ন্যাসীদের আনন্দ কত। মহানন্দে মন্দিরের চারিদিক পরিষ্কার সুরু হোলো; ঝোপ জঙ্গল কেটে, খানা-ডোবা বুঁজিয়ে কালীঘাট গ্রামকে সাজালেন সন্ন্যাসীরা। চাষবাস সুরু করলেন আশ্রয়বাসীরা। বসতি হোলো ধীরে ধীরে। মন্দিরের আশেপাশে বসল মন্দির সেবকেরা—হাড়ি, বাগ্‌দী, কামার, কুমার প্রভৃতি। মন্দিরের বাইরে কাজে তারা নিয়োজিত হোলো। জঙ্গল থেকে হোমের কাষ্ঠ সংগ্রহ করা,—মন্দির চত্বর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বলির জীব সংগ্রহ করা ইত্যাদি বহুবিধ কাজের সহায়ক ছিল তারা। দিনান্তে প্রদোষে মায়ের আরতি হোতো কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে—ওরা বাজা'ত ঢাক ঢোল—কাঁসর-ঘণ্টার তালে তালে।

তারপর পরিশ্রম লাঘব করত—কুণ্ডের পাড়ে বসে। মহুয়ারস আর পান্তাভাতের পচাই নির্য্যাস পান করে মত্ত হয়ে থাকত তারা।

সব সত্ত্বা হারিয়ে আলাপ-বিলাপের হট্টগোলে মুখরিত হয়ে উঠত কুণ্ডের তীর। পচাই নির্যাসের পূর্ণক্রিয়া সুরু হলে—একজন বলত আর একজনকে—জানিস জগা, এই পুকুরটা আমার বাবা কোদাল দিয়ে কেটে তৈরী করেছিল।

—ঠিক বলেছিস্ মামা, সেইজন্যই'ত এই পুকুরের এত মাহাত্ম্য। আমার মাসীমা রোজ রোজ এখানে ডুব দিত। যত ডুব দিত, তত সোনা পেত। মুঠো মুঠো সোনা তুলে নিতো এখান থেকে। তারপর হোতো হাতাহাতি সেই সোনার বখ্‌রা নিয়ে।

বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসীরা ছুটে আসতেন—নিবৃত্ত করতেন তাদের কলহ। বুঝিয়ে দিতেন কুণ্ডের মহিমা।—কুণ্ডের মাহাত্ম্য বোঝাতেন সকলকে।

॥ এগারো ॥

বড় পবিত্র এ'কুণ্ড! সকল অভীষ্ট পূরণ হয় এ'কুণ্ডের জলে স্নান করলে। যে কামনা নিয়ে এখানে ডুব দেওয়া যায়, মা ভগবতী তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করেন।

এ যে কালীকুণ্ড। মায়ের পদাঙ্গুলী পড়েছিল এখানে, মা প্রাত্যহিক ঘাটের কাজ সারেন এখানেই। এ কুণ্ডে ডুব দিয়ে মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না'ত হবে কোথায়?

দেশ-বিদেশের কত লোক আসেন এই কালীকুণ্ডের জলে ডুব দেওয়ার আশা নিয়ে। বন্ধ্যা নারী আশা করেন তার সুন্দর সন্তান। মৃতবৎসা কামনা করেন তাঁর সন্তানের দীর্ঘায়ু—ঘোর সংসারী আসেন তাঁর সংসারের মঙ্গল কামনা নিয়ে।

নতুন কাপড় পরে শুচি মনে একটি মাত্র কামনা নিয়ে কালীকুণ্ডে ডুব দিয়ে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করে গৃহে ফেরেন পুণ্যকামীরা।

আমার বেয়ান ঠাকরুণ সর্ব্বেশ্বর হালদারের স্ত্রী যশোদাময়ী এ কুণ্ডে ডুব দিয়ে স্বর্ণ স্বরূপ ফল লাভ করেছিলেন আমার বধূমাতা সর্ব্বাণীকে।

মায়ের সেবাইত ছিলেন সর্ব্বেশ্বর হালদার। তাঁর সেবা না করে কোন কাজে হাত দিতেন না তিনি। যজমানেরা কালীঘাটে এসে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন। বেয়াই মশাই স্বয়ং সবদিকে নজর রেখে শাস্ত্রোচিত ভাবে পূজোর ব্যবস্থা করতেন। পরম তৃপ্তিতে মাকে দর্শন করে, তাঁকে পূজো দিয়ে এসে ভক্তরা প্রণাম করত তীর্থগুরুকে প্রণামী দিয়ে।

দূর পথের যজমানেরা এক-আধ দিন থেকেও যেতেন হালদার বাড়ী। তাঁরা বলতেন—কালীঘাটে গুরুবাড়ী রাত্রিবাস করে মা-কালীর প্রসাদ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা! যজমানেরা নিজেকে যেমন ভাগ্যবান মনে করতেন, গুরুবাড়ী রাত্রবাস করে মায়ের প্রসাদ পেয়ে,—তীর্থগুরুরাও তেমন তৃপ্তিলাভ করতেন অতিথি সৎকার করে।

ভক্তেরা মায়ের লীলাকাহিনী শুনতেন তাঁর কাছ থেকে। আমিও অনেক প্রাচীন কথা শুনেছি তাঁর কাছ থেকে।

তিনি ছিলেন আমার আদর্শ। অমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ আমি অল্পই দেখেছি। অনেক প্রাচীন কথা শুনেছি তাঁর কাছ থেকে।

এক প্রহর রাত্র থাকতে শয্যা ত্যাগ করতেন তিনি। মায়ের নাম জপ করতেন ঘণ্টাখানেক একাসনে বসে। সূর্য্য উদয় হলে আসতেন কালীবাড়ীতে। তাঁর সেবা-পালা থাকুক বা না থাকুক, ঘুরেফিরে দেখতেন মন্দিরের চতুষ্পার্শে। গঙ্গার ঘাট থেকে কুণ্ডুপুকুর পর্য্যন্ত।

দয়া-দাক্ষিণ্যে শাসনে-পোষণে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। একদিন ফিরছেন তিনি বাড়ীর দিকে; মন্দিরের কি-একটা বিষয় নিয়ে যদুনাথ ভট্টাচার্য্যি মশাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন তিনি কুণ্ডুপুকুরের তীর দিয়ে, হঠাৎ তাঁর নজর ঘুরে গেল কুণ্ডের পশ্চিম তীরে। জবুথবু হয়ে ঘাড় গুঁজে বসা একটি লোকের দিকে চেয়ে. চীৎকার করে উঠলেন বেয়াই মশাই—"কে ওখানে, কি করছ তুমি?"

বসেছিল একজন যাত্রী কানে পৈতে জড়িয়ে হাতের কোষে জল নিয়ে। চীৎকারে উঠে দাঁড়ালেন যাত্রীটি, তার হৃদকম্পন সুরু হয়েছে তখন। গোবেচারার মত হাত জোড় করে দাঁড়ালো লোকটি, বললে, 'বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

তাকে বুঝিয়ে দিলেন বেয়াই মশাই—যে কুণ্ডের জলে মা অবস্থান করেছিলেন, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে মাতৃঅঙ্গ পড়ার দরুণ যে কুণ্ডের সৃষ্টি সেই কুণ্ডের তীরে ··ছি-ছি-ছি···।

দেবস্থান রক্ষক পেয়াদা-পাইকদের ডেকে ধমকে দিলেন, যদি দেবস্থানের পবিত্রতা রক্ষা না হয় তবে তাদেরও রক্ষা করবেন না সর্বেশ্বর হালদার।

আজ আর তিনি নেই। তাই বোধ হয় মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের পবিত্রতা রক্ষা হয় না।

বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গল্প বলতে বসে মনে পড়ে তাঁদের কথা। কত কথাই উদয় হয় স্মৃতিপটে !

॥ বারো ॥

কালীঘাটের কালীমন্দির যেবার প্রথম দর্শন করি, তখন আমার বয়স কতই বা হবে! পিতার সঙ্গে এসেছিলাম সেবার। প্রথম দর্শনে ভালবাসা দানা বেঁধেছিল কালীঘাটের ধূলিকণার সাথে। তারপর দ্বিতীয়বার এসেছিলাম যৌবন বয়সে মাতামহীকে সঙ্গে নিয়ে।

সেই আসাই আমার আসা হোলো। আজ স্বপ্নময় মনে হয় সে সকল কথা। সেদিনের সেই কালীঘাটকে আজকের কালীঘাটের মধ্যে কি খুঁজে পাওয়া যাবে? কোথায় সেদিনের সেই লোকজন! মহিমনাথ হালদার কৈ? ফকিরচন্দ্র হালদার কৈ? গাঙ্গুলী মশাই, গুরুপদ হালদার, এঁরা আজ সবাই চলে গেছেন—আমায় ছেড়ে। পড়ে আছে তাঁদের কীর্ত্তি ইতিহাস হয়ে মানুষের মুখে মুখে।

আমার বৈবাহিক সর্ব্বেশ্বর হালদার মশাইও চলে গেছেন বহুদূরে আমাদের ছেড়ে।

—গেছেন ত গেছেন। যাওয়ার সাথে সাথে সব নিয়ে গেছেন তিনি। যশ, মান, অর্থ, সামর্থ্য, সব কিছু চলে গেছে তাঁর সাথে।

গাঙ্গুলী মশাই অর্থাৎ ত্রিলোচন গাঙ্গুলী। গায়ে নামাবলী জড়িয়ে শিলা শালগ্রাম নিয়ে মায়ের সম্মুখে নাটমন্দিরে বসে পূজো করেন দিনের বেলায়। আর রাত্রে রাজা-উজীর সেজে যাত্রার দলে অভিনয় করেন।

দোহারা চেহারা, লম্বা বাব্‌রি চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝোলানো, মস্ত বড় বাহারী গোঁফ্, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, খড়ম পায়ে দিয়ে যাতায়াত করেন যেখানে সেখানে।

কুণ্ডুপুকুরের উত্তর দিকে পঞ্চবটী গাছের কাছ বরাবর পৈতৃক আমলের জীর্ণ বাড়ীখানার মালিক ছিলেন গাঙ্গুলী মশাই। বছর

বিশেক আগেও সে বাড়ীখানা দর্পভরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করত তাঁর দু'শো বছরেব ইতিহাস।

আজ সে নেই, তাকে পিষে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছে নতুন রাস্তা—কালীটেম্পল রোড।

আমাকে কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা করবার মূলেও ছিলেন তিনি। কবে কি ভাবে যে আমার মাতামহীর কানে মন্ত্র দিলেন, যাত্রীনিবাস থেকে টেনে এনে তাঁর বাড়ীর ভাড়াটে করে নিলেন,—সে কথা আজও ভাবি।

সংসার ছিল তাঁর অতি ক্ষুদ্র। চোদ্দ পনের বছরের একটি মাতৃহীনা বিধবা কন্যাই তাঁর সংসারবন্ধন।

মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ করে বলতেন—গৌরী আমার পা'য়ে বেড়ি দিয়েছে। তা না হলে কোন দিন চলে যেতাম সন্ন্যাসী হয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়।'

পয়সা উপায় করতেন দু'হাতে। বারো-চোদ্দ ঘর কলকাতার প্রসিদ্ধ বাসিন্দা শেঠ, বসাকদের মাসকাবারী পুরোহিত ছিলেন তিনি। রোজ কালীমন্দিরে বসে তাঁদের নামে মায়ের চরণে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো দিতেন গাঙ্গুলীমশাই।

কাঁচের শিশিতে ছিপি এঁটে মুখবন্ধ করা টিনের কৌটয় গঙ্গাজল ভরে সীলমোহর করে পাঠাতেন কলকাতার বাইরে রাজা মহারাজের নামে।

—পরিচয়?

সে সবের কোন বালাই ছিল না। শুধু ঠিকানা পেলেই হোলো, অমনি কালীমায়ের নামছাপ লাগিয়ে পার্শেল পাঠাতেন ঠিকানার মালিকের নামে। সঙ্গে এক টুক্‌রো চিঠি লিখে দিয়ে নাম স্বাক্ষর করতেন—পণ্ডিত ত্রিলোচন গাঙ্গুলী, তর্কচূড়ামণি জ্যোতিষার্ণব, যোগবিদ্যাভূষণ।

চিঠিতে লিখতেন—মহাশয়ের সর্ববিধ মঙ্গলার্থে কালীঘাট-

অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালী মাতার প্রসাদী ফুল-চরণামৃত পাঠাইলাম। মায়ের আদেশে দেশবাসীর মঙ্গলার্থে আমি এ ব্রত পালন করিতেছি, ইহার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। তবে যদি আপনি ইচ্ছা করেন, মায়ের পূজার জন্য সেবকের নাম বরাবর কিছু পাঠাইতে পারেন।

ডাক মারফৎ টাকা আসত—মায়ের পূজোর জন্য, গাঙ্গুলী মশাইয়ের নামে। সে টাকা সই করে নিত তাঁর কন্যা,—এমনই বন্দোবস্ত করেছিলেন গাঙ্গুলী মশাই। এ না করে তার উপায় কি? তাঁর সময় কোথায়? সারাদিন ত' বাইরে বাইরে কাটান, মাঝে মাঝে রাত্রেও বাড়ী আসেন না—বলেন,—যাত্রা গাইতে গিয়েছিলাম।

দিদিমাকে ভাড়াটে রূপে পেয়ে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মাসিক ছ'টাকা ভাড়া ছাড়া আর কোন সুবিধা হয়েছিল কি না জানি না—তবে তাঁর কন্যা গৌরী যে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল সে আমি জানি।

সারাদিন গৌরী এসে বসে থাকত দিদিমায়ের কাছে, পাকাচুল তুলে দিত, ভক্তিতত্ত্বের গান শোনাতো মাঝে মাঝে। সুখ-দুঃখের কথা কইত দিদিমায়ের সাথে—বলত, তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে দিদিমা।

আমাকে দেখলেই তার সব কথা বন্ধ হতো। দৌড়ে পালিয়ে যেত ঘরের মধ্যে। লাজুক নম্র স্বভাবের মেয়েটি, পাড়ওয়ালা কাপড় পরত কুমারী মেয়েদের মত। কাজে-কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখত নিজেকে।

মাঝে মাঝে ভাবতাম গাঙ্গুলী মশাইকে। উনি যে কী, তাই ভাবতাম মনে মনে। জ্যোতিষীগিরি করতেন, পুরোহিত হয়ে পূজো করতেন, ঘটকগিরি করতেন, পণ্ডিতী করতেন দু'চারজন ছাত্র নিয়ে, ব্যবসা করতেন। কি যে না করতেন, শুধু তাই ভাব্‌তাম।

নীচের অন্ধকার ঘরটার মধ্যে একপাল পাঁঠা জমিয়ে রাখতেন। যজমানদের কাছে বেচতেন সেগুলো।

সাবিত্রীব্রত করছে বহুলোকে। দিদিমায়ের পাকাচুলে সিন্দুর ঘসে

দিয়ে যাচ্ছে এয়োস্ত্রীরা, দিদিমা সেই দিকে ব্যস্ত, গৌরীর দেখা পাননি সারাদিন।

সে কাঁদ্ছে বিছানায় শুয়ে। গাঙ্গুলী মশাই ছ'দিন বাড়ীছাড়া। কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি তাঁর।

সেই দিন মাঝরাত্রে সংবাদ এলো,—তিনি বাড়ী এসেছেন, তবে একা নন্। সঙ্গে আর একজকে নিয়ে এসেছেন তিনি।—কে তিনি?

—কে আবার? গৌরীর মায়ের স্থান দাবী করে সে। সঙ্গে ছুটি বাচ্চা নিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে এসে উঠে বসলেন। গাঙ্গুলী মশাইয়ের কথাগুলো তখনও জড়িয়ে যাচ্ছে, বলছেন,—গৌরী তোর একটা মা নিয়ে এলাম; এ ছুটি তোর ভাই। প্রণাম কর তোর মাকে।

—আর প্রণাম!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গৌরী; নির্বাক হয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর তীরবেগে ছুটে এলো দিদিমায়ের কাছে। কোলের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদ্তে লাগল।

আমি তখন ঘরে বসে। সে দিন তার লজ্জা নেই, ভয় নেই—ছুটে এলো আমার কাছে। খপ্ করে আমার হাত ছু-খানি জড়িয়ে ধরে—দাদা আমায় বাঁচাও বলে, ভীষণ কান্না কাঁদ্তে লাগল মেয়েটি।

আমি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম। গৌরী আমার হাত ছেড়ে আবার ছুটে গেল দিদিমায়ের কাছে। বল্ল—তোমাদের আশ্রয়ে আমাকে একটু স্থান দাও দিদিমা। ঐ রাক্ষসীর কাছে আমায় সঁপে দিওনা তোমরা। আমি চিনি ও রাক্ষসীকে। গত অমাবস্যার দিনে ও এসেছিল আমাদের বাড়ী। লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে চন্দন তিলক কেটে রাক্ষসী এসেছিল সেদিন। ভেবেছিলাম আমাদের কোন যজমান হবে বুঝি! ওর ভাইয়ের হাতে আমাকে বেচে দিতে বলে; নগদ দাম দেবে গুণে গুণে। সেই কথাই বাবার সাথে আলোচনা করেছিল চুপি চুপি। আজ সেই রাক্ষসী বাবাকে আশ্রয় করেছে……

আর কথা কইতে পারে না গৌরী। আবেগে তার ভিতর বার এক হয়ে গেছে। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

ভোরের দিকে মাতামহীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় একপ্রহর রাত্রি থাকতেই। শিরোমনি-টোলের ছাত্ররা যখন সুর করে সমবেত কণ্ঠে মাতৃস্তব পাঠ ক'রে কালীমন্দির প্রদক্ষিণ করত দিদিমা তখন জপে বসতেন। মাঝে মাঝে গৌরী এসে তাঁর পূজোর জোগাড় করে দিত, নিজে ওখানে বসেই মায়ের ধ্যান করত—মাঝে মাঝে।

দিদিমা পূজোয় বসবেন, তাঁর মন কেঁদে উঠ্‌ছে। সে যে গৌরীর কাছে ছুটে যেতে চায়।

গেলেন দিদিমা মনের বাসনা পূর্ণ করতে; ডাকলেন,—গৌরী, ও গৌরী, গৌরীদিদি—

—কে তখন সাড়া দেবে?

গৌরী চলে গেছে এ জগৎ ছেড়ে। দেহটাকে রেখে গেছে একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে। বন্ধ ঘরের মধ্যে, চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে; মুখখানি বীভৎস হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে উঠলেন দিদিমা, একি করলি গৌরি! এ ভাবে কাকে সাজা দিলি তুই?— কাঁদ্‌তে লাগলেন তিনি।

এর পর থেকে দিদিমা ঘরে বসে আর আহ্নিক করতে পারতেন না। তাঁর মনে হোত গৌরী বুঝি তার পাশে বসে আছে। সারা ঘরে তার পায়ের আওয়াজ পেতেন দিদিমা। চলে আসতেন কুণ্ডুপুকুরের ঘাটে। সেখানেই বসে পূজা আহ্নিক সারতেন ব্রাহ্মমুহূর্তে। বলতেন, এই সময় মা ঘাটে আসেন হাতমুখ ধুতে, ঘাটের কাজ সারতে। তাই তিনি অপেক্ষা করতেন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত; যদি সে ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎ মেলে।

আঘাতে আঘাতে মানুষ পাপ-পঙ্কে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু প্রচণ্ড

আঘাতে তা থেকে মুক্ত হয়। গাঙ্গুলী মশাই আজ পাপ মুক্ত হয়েছেন। লোভ, কাম, ভোগ, বিলাস সবকিছু ত্যাগ করে,—মাথা মুণ্ডন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন তিনি।

সংসার বন্ধন ছিন্ন করে চলে এসেছে ফকির হয়ে। বেলা তিনপ্রহরে স্বপাক হবিষ্যান্ন করেন—কুণ্ডপুকুরে ডুব দিয়ে এসে। বলেন—আমার সব পাপ, সব কলঙ্ক ক্ষমা কর জননী।

ঘাটে বসে দেখেন দিদিমা। এই ঘাট-ই দিদিমায়ের সান্ত্বনার স্থল। গৌরী এই ঘাটেই ডুব দিতো তাদের সংসারের শান্তি কামনা করে ; তার বাপের মঙ্গল কামনা করে।—এ যে কল্পতরু ঘাট।

এখানে বসেই দিদিমা নির্ব্বাচন করেছিলেন ব্রজগোপালের ঠাকুমাকে।

এই ঘাটেই ডুব দিয়ে সন্তান কামনা করেছিলেন সর্ব্বেশ্বর হালদারের স্ত্রী। তারপর তিনি পেয়েছিলেন আটটি সন্তান।

আজ তাদেরই বংশধররা কালীকুণ্ডে ডুব দিয়ে সন্তান কামনা করে না, এম্‌নিতেই সন্তান পেয়ে তাঁরা কামনা করেন—আর নয় মা কালী, আর পুষ্যি বাড়িও না মা জননী—বহু পুষ্যির সংসারে।

ভাগ বাঁটোয়ারায় তাঁদের ঘাঁট্‌তি পড়বার আশঙ্কা। অভাব-অনটন ঘিরে ধরেচে তাঁদের—নাগপাশের মত। বিবাদ-বিসংবাদ, আর আত্মকলহে জর্জরিত আছেন তাঁরা। দুর্নীতি, আর অনাচার দেখা দিয়েছে তাঁদের মাঝে। স্বভাবে চরিত্রে আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়েছেন তাঁরা—

আমার বউ-মায়ের সেই চিন্তা ; মামাদের মত স্বভাব হোলো বুঝি ব্রজগোপালের। যে বংশের এত মান, এত প্রতিপত্তি ছিল এককালে আজ তা ধূলিস্বাৎ করে দিল কুলাঙ্গারেরা।

॥ তেরো ॥

ব্রজগোপালের মামা সতীনাথ। কে না চেনে তাঁকে? যারা চেনে তারা বলে—কেমন বাপের কেমন ছেলে? দেবতুল্য লোকের এমন পুত্র হতে পারে! অবাক কথা।

সিঁদুরে লম্বা টিপ আঁকা আছে সতীনাথের কপালে। দৈবাৎ যদি কোন যজমান পৈতৃক পরিচয় নিয়ে আসে তাঁর কাছে—তবে পুজো করে দেন তিনি। চ্যাঙ্গারী হাতে করে নিয়ে যান মায়ের মন্দিরে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলে পূজো করেন যজমানের নৈবেদ্য।

জড়িত জিহ্বায় কথাগুলো কেমন অস্পষ্ট হয়ে যায়। কথা বলার সময় তীব্র কটু গন্ধ বেরিয়ে আসে সতীনাথের মুখ থেকে।—যজমান চেয়ে দেখে গুরুপুত্রের অবস্থা। তাঁর কঙ্কাল কখানা খাড়া আছে কোন রকম। মায়ের বাড়ীতে পাওয়া দু'একখানা শাড়ী কাপড় তাঁর লজ্জা নিবারণ করে আজও।

আর কিছু না থাক পৈতৃক চালটুকু বজায় রেখেছেন সতীনাথ। আঙ্গুলে আড়াই প্যাঁচ পৈতে জড়িয়ে যজমানের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেন, বলেন,—মঙ্গল হোক। মাথা নত করে যজমানেরা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে তীর্থগুরুকে।

প্রণামী তুলে নিয়ে ট্যাঁকে রাখেন সতীনাথ, তারপর তাকে সম্বল করে চলে যান শুড়ীর দোকানে।

স্ত্রীপুত্রের ভাবনা ভাব্‌বার সময় নেই সতীনাথের। নিজের ভাবনাতেই মশ্‌গুল তিনি,—তাদের ভাবনা ভাব্‌বেন কখন? স্ত্রীপুত্রেরা কিন্তু তার ভাবনা ভাবে দিবানিশি।

ভোরের দিকে শুড়ীর দোকানের চাতাল থেকে সতীনাথের কঙ্কালটা তুলে নিয়ে আসে রিক্‌সাওয়ালা। বাড়ীর কাছে রিক্‌সা থামিয়ে এড়ো-কোলা করে তুলে নিয়ে আসে সতীনাথকে; ঘরের দরজায় নামিয়ে

দিয়ে বলে রিক্‌সাওয়ালা—বাবুকে আর বার হ'তে দিওনা মাইজী।

স্বামীর অবস্থা দেখে আগে ভয় পেত জয়ীর মা। এখন আর তার ভয় করে না। বহু কেঁদেছে প্রথম দিকে, এখন আর কাঁদতে পারে না। দুঃখে চোখ দুটো জলে ভরে উঠে—সে জল চোখেই শুকিয়ে যায়। ছেলেমেয়েগুলো মন্দিরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় ভিখারীর ছেলের মত।

এসব কথা স্মরণ করে চম্‌কে উঠেন সর্বাণী। শেষ পর্য্যন্ত কি এমন দশা হবে ব্রজগোপালের ?

প্রার্থনা করেন মায়ের কাছে—আর কাঁদেন মনে মনে।—আমাদের পূর্ব যশ মান ফিরিয়ে দাও মা। আমার বাপ ঠাকুর্দার সেবায় যদি কোন ত্রুটি না থেকে থাকে তবে তাঁর বংশধরকে কুপথ থেকে ফেরাও মা; তাঁরা ভাল হলেই ব্রজগোপাল ভাল হবে। তাঁদের সাজিয়ে দাও মা নতুন সাজে—কৃপা কর মা, কৃপা কর।

মা যে বড় সৌখীন। যেমন সাজাতে পারেন তেমন সাজ্‌তে পারেন তিনি।

জয়রাজ দাসকে বড় ভালবাসতেন মা। তার পিতা রাজকেষ্ট ছিল মায়ের বাড়ীর ঝাড়ুদার। সূর্য্য উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত পড়ে থাকত মায়ের মন্দির চত্বরে—আর অন্নপ্রসাদ খেত। মা-মরা কচি ছেলে জয়রাজ ঘুরত তার সাথে সাথে আর কাঁদত মা মা করে।

কাঁচা মন্দির কাঁচা চত্বর। গঙ্গার ঘাট থেকে মন্দিরের চারিদিক পর্য্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় রাজকেষ্টকে। আগাছা তুলে বনজঙ্গল সাফ্‌ করে কিছুস্থান পরিষ্কার রাখা হয় যাত্রীদের জন্য। ধুলো কাদা মেখে সেই চত্বরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘুমিয়ে পড়ে থাক'ত জয়রাজ। দুধের পিপাসা পেলে আবার কেঁদে উঠ'ত মা মা করে।

শশী বাগ্দীর মেয়ে মতি বাগ্দী এসে খানিকটা বুকের দুধ খাইয়ে তাকে শান্ত কো'রে যেত ছাগল চরাতে, রাজকেষ্ট বোঝাত তার ছেলেকে, তোর মা কোথায় আছে জানিস ? ঐ যে ঘরটা দেখছিস্ ওরই মধ্যে তোর মা লুকিয়ে বসে আছে। তুই বড় হলে তাঁকে দেখ্তে পাবি।

জয়রাজ পরিণত বয়সে বুঝেছিল তার গর্ভধারিনী গত হয়েছে বহুদিন। ঐ ঘরে যিনি আছেন তিনি শুধু তার একার মা নন্— সকলের মা। বিশ্বজননী—জগদ্ধাত্রী তিনি।

জয়রাজ রোজ আসে তাঁর কাছে। মা মা করে ডাকে, সুখ দুঃখের কথা বলে, মান অভিমান করে মায়ের সাথে। আসবার সময় এটা ওটা হাতে করে নিয়ে আসে মায়ের জন্য ; ছেলের উপার্জ্জনে মায়ের যে সম্পূর্ণ অধিকার। যত ক্ষুদ্র জিনিষ'ই হোক মায়ের তাতেই আনন্দ।

মায়ের কাছে নিবেদন করে সকল কথা, অনুমতি চায় তাঁর কাছে। বলে,—চাঁদমোহন দাসের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হতে হবে আমাকে জমিজমা পাব অনেক—চাষবাস করব ; রোজ কিন্তু তোমার এখানে আসা হবে না আমার। তোমাকেই যেতে হবে আমার ওখানে। বাড়ী বসেই তোমাকে ধ্যান করব—কি বল মা ?—যাবেত আমার বাড়ী ?

সরল মানুষের সরল বিশ্বাস। লোকে বলে পাগল। সেই পাগলকেই মা সাজিয়েছেন মনের মত করে। তাকে জমি দিয়ে জমিদার সাজালেন। ঐশ্বর্য্য ভরে দিলেন দু'হাত ভরে।

জয়রাজের বংশধরদের আজও জমিদারী, মান-প্রাতপত্তি আছে— আজও তাদের চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীপূজো হয়, আরতি হয়, বাৎসরিক পুজো হয় সমারোহ করে।

সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছিলেন মা জগদম্বা,—নিপুণ শিল্পীর মত। শক্তিময়ী শক্তি দিয়েছেন তাকে সব কিছু গড়বার মত।

মা সবাইকে সাজান বটে, কিন্তু তাঁরও সাজবার সখ হয় মাঝে মাঝে।

॥ চোদ্দ ॥

জন্ম হলেই মৃত্যু হবে; গড়ন থাকলেই ভাঙ্গন থাকবে। সৃষ্টির বৈচিত্র এখানেই। ব্রহ্মানন্দ আর আত্মারাম আশ্রম গড়েছিলেন মায়ের মন্দিরকে কেন্দ্র করে। মায়ের সেবা করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে আদর্শ বিকৃত করে দিলেন মন্দিরের পরবর্ত্তী সন্ন্যাসীরা। বহু গিরি সন্ন্যাসী আশ্রম গড়েছিলেন মায়ের মন্দিরের আশেপাশে; মাকে করেছিলেন কেন্দ্রমনি। মাকে ঘিরেই যত মন কষাকষি। উদ্দেশ্য মন্দিরের মোহান্ত হবেন তাঁরা।

ছাওয়াল গিরি, ত্রিলোচনানন্দ গিরি, জঙ্গল গিরি, দেবীদাস গিরি, এবং দেবনাথ গিরি এই পাঁচজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পাঁচটি পৃথক আশ্রমের স্থাপক ছিলেন। পৃথক আশ্রমে তাঁরা শিষ্য গ্রহণ করতেন। শিষ্য আর কালীদর্শনার্থীরা আসত বহুপথ পরিশ্রম করে, বিশ্রাম করত এখানে আশ্রয় নিত আপন আপন গুরুর আশ্রমে।

আনন্দ গিরি ছিলেন আত্মারামের শিষ্য। আত্মারামের দেহান্ত হলে তিনিই মায়ের মন্দিরের মোহান্ত হলেন। ভূবনেশ্বর গিরি তাঁরই শিষ্য। গুরুর কাছ থেকে বহু শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন তিনি। চল্লিশ বছর গুরুর সান্নিধ্য পেয়েছেন। গুরু সেবা করেছেন, মাতৃনাম ভজন করেছেন একাগ্রচিত্তে। পূজাপাঠে, হোম-যজ্ঞে ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ভূবনেশ্বর গিরি।

আনন্দ গিরির একদিন দেহান্ত ঘটলো—ভূবনেশ্বর গিরি মায়ের মন্দিরের মোহান্ত হলেন।

মোহান্ত। সকল প্রকার মোহ-অন্ত হলেই মানুষ মোহান্ত হতে পারে। কিন্তু এ মোহান্ত যেন সে মোহান্ত নয়—রাজা বাদশাহের সিংহাসনের দাবীদারের মত স্বতঃসিদ্ধ দাবীদার। সেই দাবীতেই ভূবনেশ্বর কালীমন্দিরের মোহান্ত হলেন।

মায়ের মন্দিরে তখন জনসমাগম সুরু হয়েছে ; গৃহস্থ আর গৃহী-সন্ন্যাসী পূজো নিয়ে আসে মায়ের কাছে, ফল-ফলারীর নৈবেদ্য নিবেদন করে মাকে। প্রণামী দেয়, দক্ষিণান্ত করে পুরোহিতদের। দিনমানে পুণ্যার্থিদের ভীড় হোতো তিথি নক্ষত্র উপলক্ষ্য করে।

রাজা বসন্ত রায় আসতেন মাঝে মাঝে। তাঁর রাজ্যসীমায় মায়ের আবির্ভাব, এ কি কম আনন্দের কথা? তিনি তখন থাকতেন নিজের রাজত্বে বহুলাপুরে, অর্থাৎ আজকের বেহালায়। ভুবনেশ্বর গিরির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মাতৃদর্শন আর গুরুদর্শন হোতো এক সাথে। পরম বৈষ্ণব হয়ে তিনি শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। গুরুর আদেশে তিনিই গড়েছিলেন মায়ের প্রথম মন্দির।

সেই মন্দিরের সেবাইত, মোহান্ত হয়েছে ভুবনেশ্বর সন্ন্যাসী। আনন্দের কথা। মহানন্দে আছেন ভূবনেশ্বর।

ওদিকে তখন কালীঘাটের উত্তরে বাগবাজারের জঙ্গলে চিত্তেশ্বরী নাম খুব জাগ্রত হয়ে উঠেছে। উত্তর অঞ্চলে পুণ্যকামীরা চিতু ডাকাতের চিত্তেশ্বরী কালী দর্শন করে, চিৎপুরের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পায়-হাঁটা পথে সোজা চলে আসেন কালীঘাটে।

সে কি আর আসা! চিড়ে-মুড়ির পোঁট্‌লার মধ্যে নিজের প্রাণটাকে বেঁধে দলে ভারী হয়ে আসা। পথে পড়ত শ্মশানভূমি। মানুষের শব-দেহটাকে অগ্নিদগ্ধ করত সেখানে। 'হরি নাম' ছাড়া আর কোন কথাই উচ্চারণ করত না শব-বাহিরা। ভয়ে জড়োসড়ো থাকত প্রায় সময়। কখনও বা শব-দেহটাকে আগুনে স্পর্শ করিয়ে দৌড়ে পালাত তারা ঘর পানে।

—কেন? কেন আবার কি? শব-সাধক কাপালিকেরা আসত শব-দেহটাকে জোর করে কেড়ে নিতে। খন্তা আর ত্রিশূল নিয়ে ভয় দেখাত শব-বাহিদের—শব-দেহের উপর বসে সাধনা করবে তারা।

কিন্তু যখন সতী আসত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দিতে তখন তার ত্রিসীমানায় থাকত না কাপালিকেরা। সতীদাহ' হবে—কথাটা ছড়িয়ে যেত গ্রামের মাঝে। এমন দুর্লভ দৃশ্য কি চোখে পড়ে সচরাচর? আশ-পাশের গ্রামের ভীড় ভেঙ্গে পড়ত সতীদাহ দেখতে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে সতীকে আরতি করা হোতো শেষবারের মত। এয়োস্ত্রীরা দাঁড়িয়ে দেখত সে-সব মুগ্ধ নয়নে—নিজের শেষ পরিণতি কামনা করত এমন ভাবে। স্বামী-চিতা-যাত্রী-সতীর পদধূলি তারা বেঁধে নিত অঞ্চল প্রান্তে।

যোগমায়া দাঁড়িয়ে দেখছেন সতীদাহ। বিধবা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন এক দ্বাদশী কন্যা,—স্ত্রী-জীবনের শেষ পরিণতি। জ্বলন্ত অগ্নি শিখা লকলকিয়ে উঠেছে উর্ধ্বমুখি হয়ে—ঢাক-ঢোলের বাদ্য প্রলয় তুলেছে চিতাকে কেন্দ্র করে। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে স্বামী-সোহাগী সতী; কাঁদছে আকুল হয়ে। স্বামী বিরহের ক্রন্দন—না, মৃত্যু ভয়ে বিভীষিকা, বুঝতে পারেন না কিশোরী কন্যা যোগমায়া।

—"নেনা লো, সতীর পায়ের ধূলো তুলে নে। মনের মত স্বামী পাবি—স্বামীর চিতায় শোবার স্থান হবে তোর।—কন্যাকে বোঝালেন তার মা। বিহ্বল দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন যোগমায়া। যেন সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি।

যে স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে চির বিদায় নেয় ইহলোক হতে,—সে-ই হবে সতী,—আর যে স্ত্রীলোক তা পারেনা, মৃত্যু ভয়ে দৌড়ে পালায় জ্বলন্ত চিতার কাছ থেকে—সে হবে বিধবা! সে-ই বিধবা কি তবে……? সব ঘোলাটে হয়ে যায় তাঁর কাছে। বীভৎস দৃশ্য দর্শনে কেঁদে ফেলেন সংসার অনভিজ্ঞা কিশোরী যোগমায়া।

কৈ লো, হাত দু'খানা জোড় করে ভাল স্বামী প্রার্থনা কর সতীর কাছে। কালীঘাটে কালী দর্শনে চলেছি আমরা—পথের মাঝে সতাদাহ; এ কি কম ভাগ্যের কথা! ক'জনের ভাগ্যে জোটে এমন যোগাযোগ?—জননী বোঝাচ্ছেন কন্যা যোগমায়াকে।

॥ পনের ॥

কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে এসেছেন যোগমায়া। জগত্তারিণী নিয়ে এসেছেন তাঁর কন্যাকে তীর্থভূমিতে। পথশ্রমে কাতর হয়েছেন কন্যা। মা ও কাতর হয়েছেন পথশ্রমে। কন্যা আর মা। আগে পাছে কেউ নেই তাদের। আছে সুখ-দুঃখ পরম আত্মীয়ের মত চিরসাথী হয়ে। সারাদিনের পথশ্রমে যে দুঃখ পেয়েছিলেন মা আর বেটিতে, সে সব দুঃখ জুড়িয়ে গেছে মায়ের মন্দিরে এসে। সকল পরিশ্রম সার্থক হোলো তাঁদের মাতৃ দর্শনে।

—বিশ্রাম করুন মা নির্ব্বিঘ্নে; কোন অসুবিধা হ'লে দয়া করে জানাবেন এই সন্ন্যাসী ছেলেকে—অতিথিকে নিবেদন করলেন মন্দিরের মোহান্ত ভুবনেশ্বর গিরি।

নির্ব্বিঘ্নে, নিশ্চিন্ত মনেই ছিলেন জগত্তারিণী দেবী তাঁর কন্যাকে নিয়ে। দেবস্থানে, দেব আশ্রয়ে রয়েছেন যে, তার আবার বিঘ্ন কিসের? তার সকল বিঘ্ন নাশ করবেন বিঘ্ন নাশিনী। তাঁর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছেন জগত্তারিণী শেষবারের মত।

দু'চার দিন করে, দিন দশেক মন্দির-আশ্রমে রয়ে গেলেন জগত্তারিণী দেবী। শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে—দেহের সকল গ্রন্থি আল্‌গা হয়ে গেছে। কি যে অসুখ—তার ওষুধ'ই বা কি? —যোগমায়া কাঁদেন মায়ের অবস্থা দেখে, মা বুঝি তার মারা যাবে।

অটুট স্বাস্থ্য, অপূর্ব সুন্দর দেহের গড়ন···রূপবতী যোগমায়া দুঃখে আর ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছেন। কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল মেয়েটা। ভুবনেশ্বর গিরি অতিথির সেবা করলেন প্রাণপণ করে। অভয় দিলেন যোগমায়াকে।

জগত্তারিণীর দেহ-যন্ত্রনা মিলিয়ে গেল—তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

ভবযন্ত্রনা তাঁর মিটে গেল ভবানীর চরণে এসে। অনেক কান্না কাঁদলেন যোগমায়া, একদিন সে কান্নাও থামল ধীরে ধীরে।

মোহান্ত ভুবনেশ্বর গিরি আশ্রয় দিয়েছেন যোগমায়াকে। মোহমুক্ত হতে পারেন নি তিনি। যোগমায়ার মোহে পড়েছেন আশ্রম-বাসী গিরি সন্ন্যাসী। তাঁর দেহ-যৌবন-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়েছেন ভুবনেশ্বর। ভাব্‌ছেন যোগমায়াকে ভৈরবী করলে কেমন হয়? আর ভাবাভাবি নয়—তাঁর আদিম লুব্ধ প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে ভীষণ-ভাবে। সেখানে কোন বিচার, কোন বিভেদ, কোন দ্বিধা রাখলেন না সন্ন্যাসী। নিরাশ্রয়ীকে চির আশ্রয়ী করলেন মোহান্ত ভুবনেশ্বর গিরি,—রূপ-যৌবনের মোহে পড়ে।

ভুবনেশ্বরের ভৈরবী হলেন যোগমায়া। শাস্তি গৃহীতা ভৈরবী। দু'টি প্রাণী বাসা বাঁধলেন মন্দিরের একটু তফাতে; একটু নিভৃতে। দু'য়ের মাঝে তিন এসে হাজির হোলো একদিন—একটি কন্যাদান করলেন যোগমায়া বছর দুয়েক পরে।

কন্যার নাম রাখলেন উমা। শাস্তি গৃহীতারূপে যোগমায়া বেঁচে ছিলেন বছর চারেক। ও-মা, ও মা করেই তিনি ইহজগতের সকল যোগাযোগ ছিন্ন করলেন। দু'বৎসরের শিশু উমাকে পিতার কোলে দিয়ে তিনি গেলেন পরলোকে।

ভুবনেশ্বর পড়লেন মহা দ্বিধায়। ব্রহ্মচর্যর ভেতর দিয়ে জীবনটা সুরু করেছিলেন তিনি। কেন তার স্খলন হোলো—? কি করবেন এখন এ শিশুকন্যাকে নিয়ে?

জগদানন্দ সর্দারের আস্তানা কুণ্ডপুকুরের ওপাশে। তারাই ছিল বংশানুক্রমে মন্দিরের বাইরের কাজের যোগানদার। জগদানন্দ নেই—আছে তার ছেলে পরমানন্দ। ছেলে বউ দুজনেই কাজ করে মন্দিরে। জগদানন্দের যুবতী পুত্রবধূ মন্দিরের চত্বর গোময়মাটি লেপন করছে—সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বর গিরির নজর পড়েছে সেদিকে।—ঐ'ত পারে উমাকে মানুষ করতে। জগদানন্দের স্ত্রী লক্ষ্মীকান্তকে মানুষ

করেছিল, তার বেটার বউ পারবে না আমার উমার মুখে মায়ের মত স্তন দিতে !

ভুবনেশ্বর ডাকলেন পরমানন্দকে। মাথা নত করে এসে দাঁড়ালো পরমানন্দ।—তোর তারা, আর আমার উমার প্রায় একই বয়স কি বলিস ?—জিজ্ঞাসা করলেন ভুবনেশ্বর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর।

—তোর বউ কি পারে না, আজ থেকে দু'টো মেয়েকে কোলে তুলে নিতে ?

—পারবে ; পারবে বৈকি ঠাকুর। পরম আনন্দে উত্তর দিল —পরমানন্দ।

উমা আর তারা। যেন যমজ বোন দুটি—সুখে দুঃখে মাতৃস্তন ভাগ করে নেয় দুজনে। খেলাধুলা হাসি কান্না সব'ই এক সাথে।

হৈমবতীকে মা বলে ডাকে তারা ; উমাও ডাকে মা বলে। তাদের যত আদর-আবদার, মান-অভিমান সব কিছু মাকে কেন্দ্র করে।

উমা বয়স্ক হয়েছে। জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে সাথে সাথে। চিন্তা করে —পিতা ভুবনেশ্বর সন্ন্যাসী মা-কালীর পূজারী, সেবাইত। এই মন্দিরের তিনি ই মোহান্ত। আর মাতা? তিনি পরিচারিকা, মন্দির পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন দিবানিশি। সর্দার পরমানন্দের ঘরণী তিনি। তাঁকেই মা বলে ডাকে উমা। মান-অভিমান আদর-আবদার সবই তাঁর কাছে। তাঁর'ই গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করে বলে—বলনা মা, কেন এমন হোলো ?

তারার বিবাহ ঠিক করেছে পরমানন্দ। অনূঢ়া কন্যার জন্যই'ত পিতামাতার যত চিন্তা, যত ভাবনা। সেই চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে পরমানন্দ। উমার মনে তার'ই দোলা লেগেছে—মনের কোণে কোথায় যেন একটু ঘা' হয়েছে তার,—তাই, সে ব্যথায় অস্থির হয়ে আছে। তারা তাকে ছেড়ে চলে যাবে পরের ঘরে। হোল'ই বা সে

সর্দার কন্যা। একই মায়ের কোলে মানুষ হয়েছে তারা দু'জনা। একই মাতৃস্তন খেয়েছে ভাগাভাগি করে। তারা তার বোন, তারাকে সে ভালবেসেছে ;—ভালবাসা কি অতশত বিচার করে ?

একদিন তারা চলে গেল শ্রীমন্তর হাত ধরে। উমা দেখল দাঁড়িয়ে। আগেও দেখেছে, আজও দেখল। শ্রীমন্ত একদিন দেখতে এসেছিল তারাকে—তারাও দেখেছিল জোয়ান মদ্দটাকে। জোয়ানটা একদমে একগাছ কাঠ চেলা করতে পারে কুড়ুল দিয়ে। লাঙ্গলের হাল ধরে গরু খেদাতে পারে—যেমন তারা কর্ম্মা, তেমন তারাপতি শ্রীমন্ত।

উমার কথা ভাবে ভূবনেশ্বর গিরি ; তাকে বিয়ে দিতে হবে। বাপের চিন্তা বাপের কাছে। কোথায় পাত্র,—কে নেবে গিরি সন্ন্যাসীর কন্যাকে বধূরূপে বরণ করে ?

বংশ পরিচয়। বংশ পরিচয় চায় পাত্রপক্ষ। এ কথা কোনদিন চিন্তা করেন নি সন্ন্যাসী। এক বিধবা ব্রাহ্মণীর কন্যা ছিলেন যোগমায়া, তাঁর'ই গর্ভজাত কন্যা উমা। এইটুকু তার পরিচয়।

খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলেন ভুবনেশ্বর গিরি। মায়ের কাছে বসে কাঁদেন গিরি সন্ন্যাসী—একটা উপায় কর, অপরাধের ক্ষমা কর বলে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করলেন তিনি।

এই ভাবে পক্ষকাল গত হলে, এক অমাবস্যা তিথিতে মা দেখা দিলেন ভূবনেশ্বরকে—বল্‌লেন,—বৎস, গৃহীর হাতে পূজো পেতে চাই—তুমি সেরূপ ব্যবস্থা কর। বৃথা সময় নষ্ট কোরো না, কোন গৃহী-পাত্রের সন্ধান কর।

ভূবনেশ্বর গিরি ঘোষণা করলেন—যে কেউ তাঁর কন্যা উমাকে বিবাহ করবে সেই হবে মায়ের মন্দিরের মোহান্ত। জামাইকে মন্দিরের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি দান করবেন সন্ন্যাসী। তথাপি কোন পাত্রের সন্ধান না পেয়ে শোকে ভেঙ্গে পড়লেন ভুবনেশ্বর গিরি।

॥ ষোলো ॥

এক মালাকার ছেলে এসেছেন মায়ের কাছে—তাঁকে ফুলের গয়না পরাবেন।

—পরাতে চাও পরাও ;—এমনই ভাব মায়ের। তাঁর ইচ্ছা না থাকলে কেউ কি আর জোর করে পরাতে পারে ?

হাতে ফুলের চুড়ী, ফুলের বালা, ফুলের তাগা—মাথায় মুকুট, গলায় মালা—কত সব গয়না। ফুলের সেদিন ছড়াছড়ি। মায়ের মাথার উপর ফুলের চাঁদোয়া—মন্দিরের দেওয়াল পর্য্যন্ত কারুকার্য্য করা হোলো ফুল দিয়ে। মনের সাধে সাজালেন সে দিন—মালাকার ছেলে পাঁচ সাত জন কর্ম্মচারী নিয়ে। মায়ের যেন সাধ হয় মাঝে মাঝে সাজ্‌তে-গুজ্‌তে—তাই ত আসে তার ভক্ত ছেলে—নানা উপাচার নিয়ে—মা-ই'ত ডেকে আনেন তাকে।

আর একদিনের কথা। কোলকাতার শহর তৈরী হয় নি সেকালে। এ শহরটা তৈরীর কথা চিন্তাও করেনি কেউ। জঙ্গলের মাঝে খড়-মাটি দিয়ে গড়া মায়ের ছোট কাঁচা মন্দির। আশে-পাশে কয়েক ঘর হাড়ি-বাগ্‌দীর বাস। মাঝে মাঝে আসে দর্শনার্থী সাধু সন্ন্যাসী—দক্ষিণা কালী দর্শন করতে। পথশ্রান্ত পথিক বসে বিশ্রাম করে মায়ের স্থানে। দূর পথের নৌকাযাত্রী দিনান্তে নৌকো বেঁধে রাখে কালীঘাটে, চাট্টি ডাল-ভাত ফুটিয়ে নেয় মায়ের চত্বরে এসে।

এক পথশ্রান্ত পথিক এসে বসেছেন মন্দিরের কাছে পুকুর পাড়ে, গাছ তলায়। বহু দূর থেকে আসছেন হেঁটে হেঁটে—পিতৃসন্ধান করতে। নাম ভবনীদাস চক্রবর্ত্তী। পিতার নাম পৃথ্বিধর চক্রবর্ত্তী ওরফে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী—নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত খতিয়ান গ্রাম।

শ্রীনাথ নিরুদ্দেশ হয়েছেন—ভবনীদাস বেরিয়েছেন নিরুদ্দিষ্ট

পিতার সন্ধান করতে। খুঁজে বেড়ান এগ্রাম ওগ্রাম করে ; এদেশ ওদেশ।

সূর্য্য উদয়ের সাথে তাঁর পথ চলার সুরু ; দিনান্তে বিশ্রাম করেন গাছ তলায় বসে। চিড়ে মুড়ি দিয়ে ফলার করেন কখনও—কখনও বা চাট্টি ডাল-চাল সিদ্ধ করে নেন গাছ তলায় বসে—যেদিন যেমন হয়।

পথ খরচা চাই'ত! তাই, সঙ্গে কিছু শঙ্খের শাঁখা এনেছেন ভবানীদাস। প্রান্ত ছেড়ে গ্রামে ঢুকেই শাঁখা বিক্রী করেন তিনি গ্রামের এয়োস্ত্রীদের কাছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন চলে এলেন তিনি খাসপুর গ্রামে। কালীর ঘাটের পাশ দিয়ে বরাবর রাস্তা ধরে চলে এলেন তিনি কালীকুণ্ডের পাড়ে। দু'একজন লোকের আনাগোনা আছে সে স্থানটায়। বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করলেন ভবানীদাস। পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি পাশে নামিয়ে রেখে চাট্টি মুড়ি ভিজিয়ে খেয়ে সেদিনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করবেন ঠিক করেছেন।

—তোমার ও পুঁটুলীতে কি আছে বাবা!—প্রশ্ন করলেন একজন স্ত্রীলোক। হাতের কাজ সারতে সারতে জবাব দিলেন ভবানীদাস —ওতে শাঁখা আছে মা। পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ কাহিল হয়ে পড়েছেন সারাদিনের উপবাসে। তাই, মাথা নীচু করে হাতের কাজ সার্‌তে সার্‌তে উত্তর দিলেন তিনি।

—দাও'ত বাবা আমার হাতে পরিয়ে—বিনয়-নম্র সুরে বল্‌লেন স্ত্রীলোকটি।

তাঁর হাত দুখানি কোলের উপর রেখে যত্ন করে দু'হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন ভবানীদাস। কালো রঙ্গের মেয়েটির সখ্‌ কত! সাজের কি পরিপাটি। লাল পেড়ে শাড়ী পরেছেন—কপালে দিয়েছেন তেল সিঁদুর, রুক্ষ চুলে ভল্‌ভলে করে মেখেছেন সুগন্ধি তেল—বাকী ছিল শাঁখা পরা। আজ তাই তিনি শাঁখা পরলেন।

ভবানীদাস চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে। দিনান্ত বেলা—সূর্য্য

পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। দূরের কোন স্ত্রীলোক পড়ন্ত বেলায় আসে না এতদূর। বাগ্‌দীদের কোন মেয়ে টেঁয়ে হবে। সখ্‌ করে শাঁখা পরলেন আজ—দাম দেবে'ত? মনে মনে ভাব্‌ছে ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী।

একধাপ দু'ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নামছেন পুকুরে—থম্‌কে দাঁড়ালেন, ফিরে দেখলেন শাঁখারীর দিকে। বললেন,—দামের কথা ভাব্‌ছ বাবা!—কোন চিন্তা নেই। আমি স্নান সেরে বাড়ী গিয়ে তোমার শাঁখার দাম এনে দেব।

আরো দু'ধাপ সিঁড়ি নামলেন তিনি। তারপর বল্‌লেন,—আর এক কাজ কর বাপু; ঐখানে আমার ছেলেরা আছে, তাদের কাছ থেকে দাম নিয়ে এসো। আরো দু'গাছা শাঁখা দিয়ে এসো তাদের কাছে আমার নাম করে।

—কোন দিকে? ঘাড় ফেরালেন ভবানীদাস।

ঐ যে গো বাপু? ঐ যে পাতার ঘর দেখছ,—ঐখানে। বলেই স্ত্রীলোকটি জলে নামলেন।

এগিয়ে গেলেন ভবানীদাস সেই ঘরের দিকে। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া কাঁচা ঘর। দু'খানি ঘর পাশাপাশি। এক ঘরে থাকেন সাধু সন্ন্যাসী দু'একজন, আর ঘরে মা কালী। খড়-মাটি দিয়ে গড়া মূর্ত্তি।

ভবানীদাস এগিয়ে গেলেন, সকল কথা নিবেদন করলেন সন্ন্যাসীদের কাছে।

তাঁরা'ত অবাক। কি বলছ বাপু! আমরা সন্ন্যাসী মানুষ—থাকি জঙ্গলে, শ্যামামায়ের পুজো অর্চ্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি সারাদিন। আমাদের এখানে'ত কোন স্ত্রীলোক থাকে না বাপু—তোমার মতিভ্রম হয়েছে।

ভবানীদাস কোন কথা বলেন না। বল্‌বেন কি? বলার মত কোন কথাই নেই তাঁর। দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে।

ব্রহ্মানন্দ, আত্মারাম উভয়েই গত হয়েছেন। আছেন তাঁদেরই শিষ্য ভুবনেশ্বর গিরি মায়ের মন্দিরের মোহান্ত। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না ভবানীদাসের কথা। ভাবলেন বোধ হয় কোন কালী দর্শনার্থীনী তাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

ভবানীদাস বললেন,—আমি ব্রাহ্মণ সারাদিন উপবাসী, আপনাকে প্রবঞ্চনা করতে আসিনি সন্ন্যাসী। আমি সেই মায়ের আদেশে এসেছি এখানে। আরো তুগাছি শাঁখা পৌঁছে দেবার আদেশ করেছেন তিনি। বলে,—তুগাছি শাঁখা এগিয়ে ধরলেন সন্ন্যাসীর সম্মুখে।

গিরি সন্ন্যাসী তখন সন্ধ্যা আরতির যোগাড় করছিলেন—হঠাৎ নজর পড়ল কালীর ঘরে কালীমন্দিরের দিকে।

একি! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলেন সন্ন্যাসী—অস্ফুট কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো ভুবনেশ্বর গিরির। চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—আমার অপরাধ নিও না মা।

তারপর ত্রস্ত পদে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন ভবানীদাসকে—কে তুমি ভাগ্যবান! কতজন্ম সাধনা তোমার! চতুর্ভূজা মা আমার তু হাতে শাঁখা পরেছেন,আর তু'হাত এখনও খালি। এসো এসো, দেখবে এসো।

ভবানীদাসকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী মায়ের মন্দিরের দিকে—তাঁর মূর্তির সাম্‌নে।

চার হাত প্রসারিত করে—জিহ্বা বার করে—মা দাঁড়িয়ে আছেন শিব-বক্ষের উপর। তাঁর তু হাতে শাঁখা আর তু'হাত খালি।

হ্যাঁ ঠিক, ঐ শাঁখাইত ভবানীদাস পরিয়েছেন মায়ের হাতে। সেই মাপ, সেই লাল রং,সেই শাঁখা—কাঁদতে লাগলেন ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী। কাঁদলেন ভুবনেশ্বর গিরি—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ভবানীদাসের হাত থেকে তু'গাছি শাঁখা গ্রহণ করে মায়ের হাতে পরিয়ে দিলেন তিনি।

কাঁদ ভক্ত প্রবর। কেঁদে কেঁদে যত গ্লানি যত ক্লেদ্ দূর করে দাও দেহ মন হতে। ভূমিষ্ঠ হয়ে যে নাম উচ্চারণ করে কেঁদেছিলে—সেই নাম উচ্চারণ করে কাঁদ—মা মা করে কাঁদ—

কেঁদে কেঁদে রয়ে গেলেন ভবানীদাস। মায়ের একি কৃপা! মায়ের প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন পৃথ্বিধর-পুত্র। তাঁর আর পিতৃ সন্ধানে যাওয়া হোলো না। কিছুকাল কাটালেন মায়ের চরণ তলে।

রাধা মাধবের পূজক ভবানীদাস, জগজ্জননীর সেবায় মনোনিবেশ করলেন। স্বগ্রাম থেকে শিলা-শালগ্রাম নিয়ে এসে রাখলেন মায়ের মন্দিরে। দিবানিশি ব্যস্ত রইলেন সেবা আর ব্রত নিয়ে। কখনও মায়ের পুজা করেন, কখনও রাধা মাধবের।

গ্রামে পৌঁছে ভবানীদাস তাঁর স্ত্রীকে বর্ণনা করলেন কালীঘাটের কথা। তাঁর মাতৃদর্শন ঘটল কিরূপে!—মা তাঁকে কত করুণা করেছেন,--সে কথা ভাবছেন ভবানীদাসের স্ত্রী। তন্ময় হয়ে শুনছেন স্বামীর কাছ থেকে মায়ের অপূর্ব লীলা। সাধ্বী স্ত্রী বসে আছেন দুই পুত্র যাদবেন্দ্র আর রাজেন্দ্রকে কোলে নিয়ে। চোখ বুজে অনুভব করছেন মাতৃস্পর্শ। বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রীর স্পর্শ পেয়েছেন তাঁর স্বামী—সেই স্বামীর স্পর্শ পাবেন তিনি। আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠেছে—চোখে মুখে সে আনন্দের ছাপ।

ফিরে এলেন ভবানীদাস স্বগ্রাম থেকে। রেখে এলেন স্ত্রী আর দুই পুত্রকে। ভুবনেশ্বরের কাছে দীক্ষা নিয়ে রইলেন কিছুকাল আশ্রমবাসী হয়ে।

এসকল কথা আর কাহিনী যে সব বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে শুনেছি, —যাঁরা বংশ পরম্পরায় এসকল কাহিনী, এসকল ইতিবৃত্ত লোকগাথা আর প্রবাদবাক্য করে রেখে গেছেন—গল্প বলতে বসে আজ তাঁদেরই কথা স্মরণ হচ্ছে।

যে কালে তাঁরা এসব কাহিনী শোনাতেন—সেকালে কালীকলমের ব্যবহার করতেন আর ক'জনে? কজনেই বা লিখে রাখতেন সে সব কথা।

ভাষা বলতে ছিল সংস্কৃতভাষা—লোকে বলত দেব ভাষা। যাও বা দু'একজন লিখতেন দু'একখানা পুঁথিটুঁথি সংস্কৃত ভাষায় তাওবা প্রচার হত ক'জনার মাঝে? সেকালে'ত ছাপা যন্ত্রের এত চল ছিল না, যে হু হু করে ছেপে বেরিয়ে আসবে হাজার হাজার কপি! তবে যদি লেখক মশাই ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর পুঁথির দু'চার খানা কপি হাতে লিখিয়ে নিতেন। এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁরা এই সব পুঁথির পাণ্ডুলিপি হাতে লিখে দু'পয়সা উপার্জ্জন করতেন।

লেখক মশাই যখন পাণ্ডুলিপি তুলে দিতেন 'কপি'-লিখিয়েদের হাতে, তখন বহু রকম দিব্যি দিয়ে, অঙ্গীকার করিয়ে বলতেন,—দেখ বাপু দোহাই তোমাদের চৌদ্দপুরুষের; আমার এ পাণ্ডুলিপির কোন অংশ চুরি কোর না—। যদি তেমন কিছু কর—তবে তোমার চৌদ্দ-পুরুষ নরকগামী হবেন।

যাঁরা এসব কাহিনী জানতেন,তাঁরা নিজের পাঁজরের হাড়ের মত যত্ন করতেন সে সব কাহিনীকে। অপরের হাতে তুলে দিতে ভয় পেতেন তাঁরা। কাহিনীগুলো শোনাতেন নিজেদের বংশধরদের মাঝে। বংশ-পরম্পরায় এ সব কাহিনী এগিয়ে আসত লোক-গাঁথা আর প্রবাদ বাক্য হয়ে।

অনুসন্ধিৎসু মন তারই ভেতর থেকে বেছেবুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলে নেন তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য।

পুরাণকারেরা যখন পুরাণ সঙ্কলন করেন, তখন তাঁরা বহু সন্ধান করেছিলেন পৌরাণিক কাহিনী। দেবলীলা, মনুষ্যলীলা, দেশের কথা, দশের কথা লিপিবদ্ধ করে মানুষের কাছে পুজনীয় হয়েছেন তাঁরা।

॥ সতের ॥

ভবানীদাস আছেন গিরিসন্ন্যাসীর আশ্রমে—ভুবনেশ্বর পুত্রাধিক স্নেহ করেন তাকে। একদিকে ভবানীদাস, অন্যদিকে তাঁর একমাত্র কন্যা উমা। উমা আসতেন মাঝে মাঝে, মন্দির-আশ্রমে তাঁর মায়ের সাথে। একদিন, দুদিন, তিনদিন প্রায়ই আসতেন উমা মায়ের মন্দিরে। রূপ-যৌবনে মায়ের মত সুন্দরী হয়েছেন তিনি।

—এ কি উমার মা! আমার গুরুপত্নী?—না না, তাই বা কেন হবে? আশ্রমবাসীরা যে ওঁকে সর্দার গিন্নী বলে ডাকে!—নানান চিন্তা উদয় হয় ভবানীদাসের মনে। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেবকে, সকল কথা।

ভুবনেশ্বর ভেঙ্গে চুরে সব কথা বোঝালেন—প্রিয় শিষ্য পুত্রতুল্য ভবানীদাসকে। তারপর একদিন অনুরোধ করলেন তাঁকে, উমার দায়িত্ব নিতে হবে। মায়ের আদেশ শোনালেন, বল্‌লেন,—মায়ের ইচ্ছে তিনি গৃহী ভক্তর কাছ থেকে পুজো গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীর ভাবী জামাতাই হবে এই মন্দিরের মালিক। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হবে তার একমাত্র জামাতা—একথাও শোনালেন সন্ন্যাসী।

যুবতী উমা মন্দিরে আসতেন মাঝে মাঝে, পিতা ডাকতেন তাঁকে মায়ের সেবা-কাজে সাহায্য করতে।

ভবানীদাস বহুবার দেখেছেন উমাকে, কিন্তু সেদিন দেখলেন নতুন করে। এই যুবতীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে হবে! সেই কথা ভাবেন মনে মনে। ভাবেন তাঁর গৃহের গৃহিনীকে, তাঁর পুত্রদ্বয়কে—তাদের অবস্থা কি হবে?—সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেবকে।

সব কথা বুঝিয়ে বল্‌লেন গুরুদেব। ছলে বলে প্রলুব্ধ করলেন প্রিয়শিষ্যকে। অবশেষে ভবানীদাস বিবাহ করলেন সন্ন্যাসীর কন্যা উমা দেবীকে।

ভুবনেশ্বর গিরি নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, কালীমূর্তি, কালীমন্দির সব কিছুর স্বত্ব দান করলেন জামাই ভবানীদাসকে। সম্পত্তির আয় থেকেই হবে মায়ের পুজো, ভবানীদাস হলেন তার'ই সেবাইত।

আশ্রমবাসীরা'ত অবাক! মুখে আনন্দ প্রকাশ করলেও মন তাদের ভেঙ্গে গেল। মন্দিরের মোহান্ত হবার আর সম্ভবনা রইল না কোনোদিন।

বহু দিনের প্রথা রদ্ করলেন ভুবনেশ্বর গিরি। মায়ের সেবার ভার হস্তান্তর করলেন। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে গৃহীর হাতে মায়ের সেবার ভার পড়ল।

আশ্রমবাসীরা মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে গেলেন যে যার নিজের ধান্দায়। মন্দির-সংলগ্ন আশ্রম রাখার প্রথা উঠে গেল সেদিন থেকে। বন্ধ হোলো মন্দিরে চেলা বা শিষ্য রাখার প্রথা।

শিষ্যরা চলে এলেন গঙ্গাতীরে। গঙ্গাতীর থেকে মায়ের মন্দির পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীরা বসে পড়লেন ছোট ছোট কুটির বেঁধে। শীতলা, জগন্নাথ, গণেশ, সাবিত্রী, ভুবনেশ্বরী যাঁর যা মন চাইল—তিনি সেই মূর্তি ই স্থাপনা করলেন নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

সে যুগে মন্দিরে জনসমাগম সুরু হয়েছে—মায়ের পাদপদ্মে প্রণামী পড়ছে, ছাগ বলি হয় মাঝে মাঝে গৃহী ভক্তের কাছ থেকে। যাঁরা মানৎ করতেন তাঁরাই এসে পুজো দিতেন সমারোহ করে। ছু'দশ পয়সা খরচ করতেন তাঁরা। তাতেই চলে যেত মন্দির-মোহান্তদের। এবার সব কিছু পাওনা হোলো, জামাই ভবানীদাসের।

ভবানীদাস আর উমা রইলেন মন্দিরের মালিক হয়ে। শ্রীমন্ত আর তারাসুন্দরী রইল মন্দিরের সেবক হয়ে। এক মন, এক প্রাণ ছিল উমা আর তারার। একদিন তা চিড় খেয়ে গেল। উচু-নীচু ভেদ দেখা দিল ছু'জনার মাঝে।

বুঝতে পারলেন ভুবনেশ্বর গিরি। বুঝতে পেরেই সে বিভেদ দূর করে দিলেন।

—একই মায়ের দু'টি কন্যা তোমরা,—একই সঙ্গে স্তন পান করেছ ভাগাভাগি করে। তোমাদের মধ্যে বিবাদ থাকা উচিৎ নয় কোন প্রকারে। কেউ কারো সীমা অতিক্রম কোরো না। তারার মা, ঠাকুমা চিরকাল সেবা করে এসেছে মন্দিরের মোহান্তদের। তারারও হবে সেই বৃত্তি। বংশ পরম্পরায় এই বৃত্তি চলবে চিরকাল।

মন্দির মাঝে যা কিছু আয় হবে, উপায় হবে, সব কিছুর মালিক হবে কন্যা আর জামাই—উমা আর ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী। মাকে যা নিবেদিত হবে, মায়ের চরণে যা প্রণামী পড়বে, তাঁকে উৎসর্গীকৃত যাবতীয় দ্রব্যাদি সব কিছুর মালিক কন্যা আর জামাই।

শ্রীমন্ত আর তারাসুন্দরীর জন্য রইল মন্দিরের বাইরের সব কিছু। বলির ছাগ অথবা মহিষের মুণ্ড ইত্যাদি, মন্দির চত্বরে যদি কখনও পূজা অনুষ্ঠান করে ভক্তবৃন্দ; তার সব কিছু ছাড়াও বাস্তু-ভিটে, নিত্য অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত করে দিলেন ভুবনেশ্বর গিরি! কোন কিছুর ত্রুটি রাখলেন না ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়।

অনেক বিবেচনা করে এ ব্যবস্থা করেছিলেন ভুবনেশ্বর গিরি। উমা আর তারা প্রসন্নমনেই সে ব্যবস্থা মেনে নিলেন। বিবাদ তাদের মিটে গেল।—তারা আর শ্রীমন্ত সেবক, মন্দির মোহান্তদের সেবা করাই তোমাদের বৃত্তি,—একথা ভুলো না কখনও। পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন গিরি সন্ন্যাসী।

॥ আভাস ॥

ভবানীদাস আছেন মন্দির মাঝে। মায়ের পুজো করেন, আরতি করেন, মায়ের ভোগ রাঁধেন, ভোগ নিবেদন করেন, মহানন্দে করেন সব কিছু। তারা আর শ্রীমন্ত কোন ত্রুটি রাখে না কোন দিক দিয়ে। কিন্তু উমা?

সন্তান সম্ভবা হয়েছেন উমা। তিনি এবার মা হবেন। মায়ের পুজোয় কোন অংশে লাগেন না তিনি। শুধু তখন কেন?—কোন সময়ই ভবানীদাস মায়ের ভোগ ছুঁতে দিতেন না আপন স্ত্রী উমাদেবীকে। কেন এ ছুঁৎ-স্পর্শের ভয়? কি হয়েছে তার?—একথা উমা চিন্তা করতেন নিভৃতে বসে। যত তিনি চিন্তা করেন ততই রহস্য-জালে জড়িয়ে পড়েন।

দিন যায়,—যত দিন যায় মন্দিরে ততই জনসমাবেশ বাড়ে ধীরে ধীরে। দূর দেশান্তর হতে লোক আসে কালীঘাটে দক্ষিণাকালী দর্শন করতে।

এদিকে বংশ বৃদ্ধি হোলো ভবানীদাসের। তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। যাদবেন্দ্র, রাজেন্দ্র নামে দু'টি পুত্র ছিল তাঁর, এবার হোলো রাঘবেন্দ্র। পক্ষ হলো দু'টি,—এপক্ষ আর ওপক্ষ।

মন্দিরে কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে—একহাতে সব কিছু পেরে উঠেন না ভবানীদাস। দেখেশুনে উমা মনে মনে দুঃখ পায়। মায়ের মন্দিরে মাথা ঠুকে বলেন,—এর কিছু উপায় কর অন্তর্যামী। আমার অন্তরের কথা বুঝে নাও মা।

অন্তর্যামী বুঝলেন উমার অন্তরের কথা। সে তার স্বামীর পরিশ্রম লাঘব করতে চায়। বললেন,—"কেন, তুমি যদি না পার

তবে তোমার সতীনকে আনিয়ে নাও যশোহর জেলা থেকে। যাদবেন্দ্র আর রাজেন্দ্রর হাত ধরে চলে আসুক সে এখানে। সেই'ত পারে তোমার অন্তর্জ্বালায় প্রলেপ দিতে।"

—হ্যাঁ ঠিক। উমার মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। স্বামীর পরিশ্রম লাঘবের উপায় নির্দ্দেশ করেছেন তাঁর আরাধ্যা জননী।

উমার আহ্বানে ভবানীদাসের প্রথমা স্ত্রী এলেন কালীঘাটে। দর্শন করলেন জগদ্ধাত্রীকে,—মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন বহুক্ষণ। অন্তর তাঁর কেঁদে কেঁদে আপ্লুত হয়ে গেল।—করুণাময়ীর কত করুণা, কত দয়া! তাঁর স্বামীর হাত থেকে মা শাঁখা পরেছেন—তাঁকে দয়া করেছেন—কেঁদে কেঁদে কাত্যায়ণী বলছেন এ'কথা। তাঁর মুখে কোন ভাষা নেই, তন্ময়-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর নয়ন-কোণ হতে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো করুণাময়ীর উদ্দেশ্যে।

—মা, ওমা, তুমি আমার বড় মা?—আধো আধোস্বরে জিজ্ঞাসা করছে, রাঘবেন্দ্র। গর্ভধারিণীর কোলে চেপে আঁচল ধরে টান্‌ছে তার সৎমাকে।

তাকে কোলে টেনে নিলেন কাত্যায়ণী—বুকে জড়িয়ে ধরলেন সতীন পুত্রকে।

অদূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন ভবানীদাস—মনে মনে খুসী হলেন তিনি।

কাত্যায়ণী আর উমা। তুজনে ভাগ করে নিলেন স্বামীর পরিশ্রমের অংশ। কাত্যায়ণী মন্দিরে পুজোর জোগাড় দেন, ভোগ রাঁধেন—আর উমা থাকেন বাইরের অন্য সকল কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত।

শান্তি। মহাশান্তিতে চল্‌ল তাঁদের মাতৃসেবা। কোন দ্বেষ নেই, বিবাদ নেই—অভাব নেই—অভিযোগ নেই। তিন পুত্র আর তুই স্ত্রী নিয়ে ভবানীদাসের সংসার রইল চির শান্তিময় হয়ে।

এই'ত মায়ের কৃপা। যেখানে মায়ের কৃপা থাকে সেখানে বিবাদ-বিসংবাদ থাকতে পারে! অশান্তি আসতে পারে কখনও!

তাইত' সর্বাণীর একমাত্র প্রার্থনা—মাগো কৃপা কর।—হবে, ভাল হবে তোর ব্রজগোপাল, কৃপাময়ী বলেছেন সর্বাণীকে। স্বপ্নের ঘোরে দেখা দিয়েছেন মা জননী। দিবানিশি যাঁকে চিন্তা করেন তাঁকে স্বপ্নে দেখবেন না'ত দেখবেন কাকে?

॥ উনিশ ॥

ঠাকুররাজ বিদ্যালঙ্কার মশাই এসেছেন ভাগবত শোনাতে। দুর্গাবাড়ীর মণ্ডপে চৌকী পেতে বসেছেন তিনি। অদ্ভুত-সুন্দর চেহারার পুরুষ। গৌরবর্ণ রূপ, চেলির কাপড় পরণে—গলায় সোনার হারে ইষ্ট কবচ বাঁধা। কপালে চন্দন তিলক—দেখ্‌লেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ে।

আমি তখন খুব ছোট—ঠাকুমার আঁচল ধরে চলি। তার কোল ঘেঁসে বসে ঠাকুরের কথা শুনছি—ওপাশে ঠাকুর্দা, তার ওপাশে মা বসে আছেন—অন্যান্য বউঝিদের মাঝে। হাত কয়েক দূরে রায়েত-কায়েত, তেলী, কামার অন্যান্য ভক্তবৃন্দ! যার ভক্তি আছে সেইত ভক্ত। ভক্তের চোখে মানুষ ভগবান হ'য়ে উঠেন।

যে আসে সেই মাথা নত করে প্রণাম করে ঠাকুররাজ মশাইকে—তারপর ঠাকুর্দাকে ;—বলে, ঠাকুরবাড়ী এসে ঠাকুর প্রণাম করলাম।

ভাগবত নিয়ে যিনি আলোচনা করেন তিনিই'ত ভগবানের অংশ, কোটী অংশের এক অংশ। যিনি সহায়তা করেন তিনিও তাই। যিনি শ্রবণ করেন, যাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে ঈশ্বরকথা—তাঁর দেহ পবিত্র হয়—পাপ মুক্ত হন তিনি।

হ'রে চোরা। আমাদের রাখাল হরিচরণ সাধু খাঁ। হাত-টানের মাত্রা এত বাড়িয়ে ফেলেছিল যে, সময় মত সে কাজ করতে না পারলে—সারাদিনরাত্রে এতটুকুও স্বস্তি পেত না। ঘটিবাটি থেকে সুরু করে, ক্ষেতের ফসল, জলের মাছ, ছাগল, গরু পর্যন্ত কোনটাই বাদ দিত না সে। তা'হলে কি হবে? মনিবের সম্পত্তি রক্ষা করত বুক দিয়ে—সেগুলো ছিল তার কাছে বুকের রক্ত।

বড় দাঙ্গাবাজ ছিল হ'রে চোরা। একটু ছুতো পেলেই হোলো—অমনি দাঙ্গা বাধিয়ে বসে থাকবে। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়াই

ছিল তার স্বভাব। তার হাতের গোটা ছুই লাঠির ঘায়ে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে অনেকের।

চুরির দায়ে বার বার ধরা পড়ে হরিচরণ হয়েছে—'হ'রে-চোরা।' পড়শীরা বলেন—হ'রে চোরা মুখুয্যে বাড়ীর পুষ্যি-পুত্তুর।

একরকম তাই বটে। যতবার অপরাধ করেছে,—ঠাকুর্দা ততবার তাকে গৃহছাড়া করেছেন। ছুদিন বাদে—সে আবার ঘুরে এসেছে —তাঁর পা ছু'খানি জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে আর বলেছে—এমন পাপের কাজ কখনও করব না ঠাকুর, এবারের মত ক্ষমা কর।

হরিচরণ বৃদ্ধ হয়েছে—দেহে তার জোর নেই। তেল চক্‌চকে লোহার মত পেটা-দেহটার চামড়াগুলো ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। গোঁপজোড়া পেকে সাদা ধপ্‌ধপে হয়ে গেছে। মাথার চুল পেকেছে, ভ্রু'ছুটি পেকে সাদা হয়েছে, দেহের লোমগুলি পর্য্যন্ত পেকে ভূরভূরে হয়েছে। আজ তার দেহ পেকেছে—বুদ্ধিও পেকেছে।

সেই পাকা হরিচরণ এসে বসেছে ভাগবত শুন্‌তে। ভক্তের মাঝে ভগবানের আলোচনা।

—অনেক পাপ করেছি ঠাকুর;—আমার কি মুক্তি হবে? ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল হরিচরণ।

নিশ্চয়ই হবে, ভক্তিতেই মুক্তি হবে। মন দিয়ে ঈশ্বর কথা শোন। ঈশ্বরের আলোচনা কর, তাঁর অনুশাসন মানো, তাঁর শ্রীচরণ চিন্তা কর—মুক্তি হবে বৈকি! শ্রবণে মুক্তি, দর্শনে মুক্তি, স্পর্শনে মুক্তি, সঙ্গলাভে মুক্তি—

সতীর কথা শোনাচ্ছেন ঠাকুররাজ মশাই। দক্ষরাজের যজ্ঞ-কথা ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

প্রজাপতি দক্ষরাজ শিবহীন যজ্ঞ করবেন ঠিক করেছেন! শ্বশুর জামাইয়ে ভারী বিবাদ। নেশাভাঙ্গ করা ভোলানাথ জামাইকে বাদ দিয়ে—দক্ষরাজ ত্রিভুবনের সকলকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন। জামাই হয়ে

শ্বশুরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নি মহেশ্বর। একি সহ্য করা যায়? তাই তাঁকে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ পাঠালেন সকলকে।

একদিন ভৃগুমুনির আশ্রমে মহাযজ্ঞের আয়োজন—সবাই উপস্থিত সেখানে। দক্ষরাজ এসে হাজির হলেন—যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আসুন আসুন বলে,—সকলেই গর্বিত দক্ষরাজকে অভ্যর্থনা করলেন।

জামাতা শিব কিন্তু শ্বশুর মশাইকে কোন রকম অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন কিছুই করলেন না।

জামাইয়ের এরূপ ব্যবহারে—দক্ষরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন মনে মনে। দু'একটা কটু উক্তি করলেন, জামাইয়ের উদ্দেশ্যে। ভোলানাথ জামাই সে কথা কানেই তুললেন না। উত্তর দেবেন কি?—এ ব্যাপারে দক্ষরাজ আরো বেশী অপমান বোধ করলেন।

কি আর করেন! শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন—তিনি এমন এক মহাযজ্ঞ করবেন এবং সেই যজ্ঞে ভাঙ্গর-ভোলা জামাইকে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ দেবেন ত্রিভুবনের সবাইকে। শিব বুঝুক অপমান কাকে বলে!

যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসে হাজির হলেন—একে একে। যত দেব, ঋষি, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই এসেছেন যজ্ঞভাগ নিতে—কিন্তু, জামাই কৈ?

সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করেন। সকল দেবের নিমন্ত্রণ যেখানে, সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব কৈ? পিতার যজ্ঞস্থলে কন্যা কৈ? —জামাই কৈ?

জামাইকে অপমান করতে কন্যাকেও নিমন্ত্রণ দেন নি দক্ষরাজ। যাঁর শক্তিতে শক্তি সেই শক্তিরূপা গৌরী হলেন পিতার যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিতা।

মহর্ষি নারদ মুনির উপর ছিল ত্রিভুবনময় নিমন্ত্রণের ভার। বীণা বাজাতে বাজাতে তিনি গেছেন আগে ভাগে কৈলাসধামে। হাজির ত

হাজির—একেবারে মহাদেবের সম্মুখে হাজির হলেন মহর্ষি। মৃদু হেসে বললেন তিনি—

"শুন মামা মোর নিবেদন,
তোমার শ্বশুর যজ্ঞ করে—
নিমন্ত্রণ দেয় সবারে,
তোমারে না করে নিমন্ত্রণ।"

কৈলাসপতি জান্‌লেন সকল কথা। যিনি দেবকুলের দেবতা তাঁর অজানা কি থাকতে পারে!

মহর্ষিকে বললেন মহাদেব—ভাল বার্তা শোনালে ভাগ্‌নে—তারপর চুপি চুপি বল্‌লেন, ভাগ্‌নেকে—দেখ বাপু, সতীকে এ'কথাটা গোপন রেখো—শুন্‌তে পেলে মনঃ কষ্টে তার আর অবধি থাকবে না।

হাসতে হাসতে মহর্ষি বললেন—

"ওগো মামা, আমাকে না কোরো মানা
আমার কাছে গোপন কথা থাকে।"

পাগল হলে মামা! ও'স্বভাব আমার নয়। আমি একটিবার মাত্র অন্তঃপুরে যাব,—মামীকে প্রণাম করেই ফিরে আসব—যেমন বলা তেমন কাজ। আর বিলম্ব করলেন না মহর্ষি—অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বল্‌লেন—

"শুন শুন ওগো মামী,—দুঃখের কথা কহিতে বুক ফাটে,
তোমার পিতা যজ্ঞ করে—নিমন্ত্রণ দেয় সবারে;
শিব আর শিবানীরে না দেয় নিমন্ত্রণ—
একথা রটিছে সকল হাটে।"

ব্যাস্, তাঁর কাজ ফুরিয়ে গেল—তিনি চল্‌লেন অন্য কাজে।

সতী এলেন পশুপতি শিবের কাছে—নিবেদন করলেন মনের কথা। শিব তাতে নারাজ। বল্‌লেন,—"বিনা নিমন্ত্রণে যাবে কেমনে?"

—সকল ওজর আপত্তি খণ্ডন করলেন সতী,—বাপের বাড়ীতে তাকে আসতেই হবে। এলেন তিনি দক্ষযজ্ঞে।

দক্ষরাজের বড় গর্ব্ব, বড় দর্প। দেবগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত তাঁর জন্য। এই গর্ব্ব খর্ব্ব করতে আদ্যাশক্তি মহামায়া কন্যারূপে জন্ম নিলেন দক্ষরাজের ঘরে। বিবাহ করলেন—সংহার-কর্ত্তা মহাদেবকে। মায়াময়ীর অনন্ত লীলা। লীলাময় জগৎ। দক্ষরাজের সেই লীলাময়ী কন্যা গৌরী শুধালেন, পিতারে—

"একি পিতা দক্ষভূপ—একি হেরি অপরূপ—
বিমুখ করিলা কেন মোরে ?
অন্যসব জামাতাবর্গে সকলে আনিলে যজ্ঞে
শিবকে যজ্ঞে কেন না আনিলে ?"

দক্ষ প্রজাপতি কন্যার দুঃখ বুঝলেও মুখে স্বীকার করলেন না। ঠিক হয়েছে,—এই'ত তিনি চেয়েছিলেন। এইভাবে শিবকে অপমানিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন তিনি।

গৌরী উৎকর্ণা হয়ে রয়েছেন—পিতার মুখের উত্তর শোনার জন্য—

দক্ষরাজ বললেন—

"ওমা সতি,
পাগল তোমার পশুপতি
তাকে যজ্ঞে আনিব কেমনে ?
শিব সদা শ্মশানেতে রয়—
মড়ামড়ি যথা পায় ;
শিবের যজ্ঞ সেইখানে"—

স্বামীর নিন্দা। কোন সতী স্বামীর নিন্দা শুন্‌তে পারে ? লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে গৌরী চোখে অন্ধকার দেখলেন। যিনি দেবের দেব যাঁকে সকল দেবতা অশেষ সম্মান করেন—যিনি শক্তিরূপার একমাত্র উপাস্য দেবতা, তাঁর নিন্দা শক্তিরূপা গৌরী সইবেন কিরূপে ? জগদ্ধাত্রী এ অপমান সহ্য করতে পারলেন না,—মূর্চ্ছা গেলেন।

দক্ষরাজত' অবাক ! তিনিত' এরূপ আশা করেন নি। শিবকে অপমান করতে চেয়েছিলেন—গৌরীর কোন অনিষ্ট চান নি তিনি।

খবর পেয়ে গেলেন দেবাদিদেব—শক্তি মূর্চ্ছা গেছেন। যেথায় শক্তি সেথায় শিব। শিব ছুটে এলেন শ্বশুর বাড়ী মূর্চ্ছিতা শক্তির কাছে। শক্তিই টেনে আনলেন শিবকে।

সঙ্গে এলো ভূতপ্রেত, চেলাচামুণ্ডা। নৃত্য সুরু করে দিল তারা। মূর্চ্ছিতা সতীকে কাঁধে তুলে নিলেন ক্ষেপানাথ। তাথৈ তাথৈ করে নাচতে লাগলেন তিনি। পৃথিবী বুঝি রসাতলে যায়। নটরাজ নাচ্‌তে সুরু করেছেন—ভীষণ রুদ্র মূর্তি। যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছেন যজ্ঞস্থল ছেড়ে। দিক্ বিদিক্ হারা হয়ে ছুটছুটি করছেন সকলে—কে কাকে সামাল দেয়। দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

সকলে ছুটে গেলেন বিষ্ণুর কাছে—একটা কিছু উপায় কর, রক্ষা কর—প্রস্তাব নিয়ে।

শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বিষ্ণু চিন্তিত হলেন। অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে তিনি বিষ্ণু-চক্র দিয়ে শিবস্কন্ধস্থিত সতীর দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিলেন। সেই খণ্ড ছিট্‌কে পড়লো পৃথিবীতে। মহাদেব থামলেন,—তিনি সুস্থ হলেন—পৃথিবী ঠাণ্ডা হোলো।

যেসকল স্থানে সতীর খণ্ড অঙ্গ পড়েছিল—সেই সব স্থান'ইত পীঠস্থান। এমন করে পৃথিবীর একান্ন স্থানে পড়েছিল সতীর অঙ্গখণ্ড—তৈরী হয়েছে একান্ন পীঠস্থান। শিব কিন্তু সতীকে ছেড়ে যাননি কোথাও। যেখানে সতী-অঙ্গ পড়েছে সেখানেই শিব আছেন পীঠ রক্ষক হয়ে—ভৈরব রূপ ধারণ করে।

কাশীতে হয়েছেন কালভৈরব—সতী হয়েছেন দেবী বিশালক্ষ্মী—উৎকলে পড়েছে—নাভি; দেবী হয়েছেন বিমলা,—ভৈরব জগন্নাথ। কুরুক্ষেত্রে পড়েছিল দক্ষিণ পায়ের গুলফ্—দেবী হয়েছেন সাবিত্রী, ভৈরব স্থাণু। কামরূপ কামাক্ষায়—দেবী কামাক্ষা, ভৈরব উমানন্দ। কালীক্ষেত্রে কালীপীঠে পড়েছিল মায়ের দক্ষিণ পায়ের চারিটি আঙ্গুল। সতী রূপ নিয়েছেন দক্ষিণা-কালী—ভৈরব নকুলেশ্বর।

॥ স্মৃতি ॥

তন্ময় হয়ে শুন্‌ছিল হরিচরণ ঈশ্বরীয় কথা। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছিল সেদিনের ভাগবত পাঠ। রোজ শোনে,—সন্ধ্যের সময় এইটুকু শোনার জন্য সারাদিনের অপেক্ষা করে সে। ঈশ্বরীয়-আলোচনাই ত ঈশ্বর ভক্তি জাগায়—দেবচরণ দর্শন বাসনা জাগে ভক্তের মনে।

একদিন সে বায়না ধরে বসল ঠাকুর্দার কাছে—সে তীর্থে যাবে। তীর্থের দেবতাকে দর্শন করবে হরিচরণ।

সত্যি সত্যি তীর্থের ঠাকুর ডাক দিলেন হরিচরণকে একদিন—বেরিয়ে পড়ল সে। পাছে কোন বাধা পড়ে, কোন বিঘ্ন এসে হাজির হয়, তাই রাতের অন্ধকারে চোরের মত গা'ঢাকা দিয়ে চলে গেল সে।

ঠাকুমা দুঃখ করলেন—চোখের জল ফেলে। বল্‌লেন,—যাবি'ত যা বয়সের কালে যা;—এই বৃদ্ধ বয়সে কি দূর দেশে যাওয়া পোষায়?—না চেনে পথ ঘাট, না আছে পাথেয়। কিসের সম্বলে হরি পাড়ি দিল!—এই দুঃখই ঠাকুমার প্রাণে বাজল বেশী করে।

আজীবন এ বাড়ীতে কাটাল হরিচরণ। সেই বাল্যকাল থেকে আছে ঠাকুমার কাছে। সংসার-ধর্ম্ম কোরল না কোনদিন, ছ্যাচ্‌রামো আর দাঙ্গাবাজী করে কাটালো জীবনটা। নিজের জন্মভূমিতে যখন মরবার সময় হোলো—তখন ছুটলো অন্য দেশে। বিদেশ বিভুঁইতে জীবনটা যাবে শেষ পর্য্যন্ত।

ফিরে এসেছে হরিচরণ বছর দেড়েক পরে। মস্তক মুণ্ডন করেছে,—তার সখের বড় গোঁফ জোড়া দিয়ে এসেছে বিশ্বনাথের চরণে। আকণ্ঠ সুধা পান করে এসেছে তীর্থভূমি থেকে। মরণ

তার সেইখানেই হোতো ঠিকই,—শুধু ঠেকে রয়েছে তার কাতর আবেদনে।

মৃত্যু যেদিন তার শিয়রে দাঁড়িয়ে, সেইদিন চোখের জল অর্ঘ্য দিয়ে বিশ্বনাথের চরণে নিবেদন করেছিল হরিচরণ—আর দুটোদিন সময় দাও বিশ্বনাথ,—আমার জন্মভূমিকে প্রণাম করে আসি। আমার ইহজন্মের মা বাপ—মনিব আর মনিবগিন্নীর পদধূলি নিয়ে আসি।

সেই ধূলি নিতে এসে দাঁড়িয়েছে হরিচরণ,—পদধূলী নিয়ে আজই রওনা হবে বিশ্বনাথের চরণে। ঠাকুর্দা তাকে পদধূলি দেবেন কি!—বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেন। ওরে, তোকে স্পর্শ করেও যে আমার মুক্তি হবে। তীর্থ-ফেরৎ লোকের স্পর্শ পেলে তীর্থদর্শনের কিছু ফল লাভ হয়।

বাড়ী ভর্ত্তি লোক,—সবাই এসেছে হরিচরণকে দর্শন করতে। তার মুখে শুন্‌ছে তীর্থের কথা। অনেকে তার পদধূলি তুলে নিচ্ছে ভক্তিভরে। তীর্থের ধূলিকণা জড়িয়ে আছে তার সারা অঙ্গে। কেউ কেউ বল্‌ছে ভক্তিতে মুক্তি পেয়ে গেল হ'রে চোরা। পাপ মুক্ত না হলে কি আর তীর্থ দর্শন, দেবদর্শন হয়?

উত্তেজনা, পরিশ্রম, অনিয়ম আর ক্ষুধা সকলে মিলে বৃদ্ধ হরিচরণকে একেবারে কাহিল করে তুলেছে—পথ আর চলতে পারে না সে। পড়ে ছিল ঘাটের পাড়ে গাছ তলায়। অন্তিম বাসনা বুক-খানায় ভরে রেখেছিল হরিচরণ। অন্তিম জিজ্ঞাসা ছিল মনে,—আমার কি তীর্থ দর্শন হবে না—আমি কি পাপ মুক্ত হব না?

পড়েছিল গাছ তলায় শক্তিহীন হয়ে। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ঘুরে এলো বার কয়েক। চেতনাহীন বেহুস হয়ে পড়ে ছিল তার দেহটা—মৃত্যুপথ যাত্রী হয়ে।

একদিন যে কেমন করে চেতনা পেল, তার হুস্‌ হোলো জনকয়েক সাধুসন্ন্যাসীর সেবায়,—সে কথা হরিচরণ ব্যাখ্যা করে বলতে পারে নি। শুধু বলেছিল,—“চোখে চেয়ে দেখলাম মাঠান্‌, আমি কাশীক্ষেত্রে

বাবা নকুলেশ্বরের মন্দিরে পড়ে আছি। সাধু-সন্ন্যাসীরা আমার গা'য় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মন্দিরের পাশেই জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ড —জটা-জুটধারী এক সন্ন্যাসী গায়ে ভস্ম মেখে, চোখ দুটো আধ বোজা করে বসে আছেন সেই কুণ্ডের সামনে। ভক্তি করে প্রণাম করলাম সন্ন্যাসী ঠাকুরকে—মনে করলাম এই'ত বাবা বিশ্বনাথ, মন্দির আগলে বসে আছেন। ভক্তি করে তাঁকে প্রণাম করলাম—তাঁর সেই কুণ্ডের··· কুণ্ডের ভস্ম কাপড়ের খুঁটে বেঁধে আনলাম তোমাদের জন্যে—"

দিদিমার কাছে বেড়াতে গেছি। নাতি দেখে'ত তিনি ভারী খুসী। বল্‌তেন,—গল্পে নাতি এসেছে—। আমাকে দেখ্‌লে তাঁদের কাহিনী শোনার বাতিক বাড়ে। দিদিমা, দাদামশাই আরো জনকয়েককে শোনালাম সেদিন হ'রে চোরার কাহিনী। কালীঘাট আর কালীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য।

শুনে দিদিমা খুসী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসলেন আমাকে—আমায় একটিবার কালীদর্শন করিয়ে আনবি শিবু? কালীক্ষেত্রে গিয়ে গঙ্গায় ডুব দেব, মা-কালী দর্শন করব, বাবা নকুলেশ্বরের চরণে গড়াগড়ি দেব—এ বাসনা আমার বহুকালের। এখন নতুন রেলগাড়ী হয়েছে,—জল পথ বলে তোর দাদামশাইয়ের আপত্তি ছিল, এখনত আর সে ভয় নেই!

পথ হয়ত লাঘব হয়েছে দিদিমা,—কিন্তু তোমার দেহটাকে নিয়ে'ত ভয় আছে।

না না, আর আপত্তি করিস না ভাই, তোর দাদামশাই ত নানান আপত্তি দেখিয়ে আমার সারা জীবনটা কাটিয়ে দিল। মরবার বয়স যখন হয়েছে তখন কবে হুট্ করে মরে যাব,—মায়ের চরণ আর দর্শন হবে নারে!

দিদিমার বয়স হয়েছে—ষাট পেরিয়ে সত্তর ছোঁয়া ছোঁয়া। মাথার চুলগুলি সাদা রেশমের মত। সেই পাকামাথায় চওড়া

সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দিয়ে লাল পেড়ে শাড়ী পরে দাঁতশূন্য- মুখে হেঁসে হেঁসে যখন তিনি আশীর্ব্বাদ করেন সকলকে—তখন অনেকে বলতেন—মা ভগবতী মানবীর বেশে আশীর্ব্বাদ করছেন সকলকে।

আমার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম,—ও ভগবতী দিদিমা, তুমি যেখানে থাক সেই স্থানই'ত তীর্থস্থান। আবার তীর্থ ক্ষেত্র দর্শনের বাসনা কেন? দু'চার বছর আগে হলে না হয় চেষ্টা করে দেখতাম, কিন্তু এখন যে তোমার ঐ ভাঙ্গা চোরা দেহটা ঝোড়ায় বসিয়ে নিয়ে যেতে হবে—

—কোন রকমে এই দেহ-খাঁচাটাকে কালীঘাটে একবার পৌঁছে দে ভাই—মায়ের চরণ ছুঁইয়ে তারপর না হয় গঙ্গায় ফেলে দিস্। কত যত্নে মাজা-ঘসা করে রেখেছি এই দেহটাকে। তোর দাদুকে রেখে যেতে পারলেই আমার যাওয়া সার্থক। আমার এই জীর্ণ দেহ-খাঁচাটা সেখানে বয়ে নিয়ে চল দাদা।

দিদিমার সেই দেহ-খাঁচাটার মধ্যে প্রাণপাখীটাকে আটকে নিয়ে কালীঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম একদিন।

পিতামহর যুগ চলে গেছে—এসেছে নতুন যুগ,—যন্ত্রের যুগ। দূরত্বকে কাছে টেনে মানুষের পরিশ্রমকে লাঘব করেছে। আমরা রেলে চড়ে চলে এলাম বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়—একেবারে কালীঘাটের উদ্দেশ্যে। সে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্বের কথা। কোথায় তখন হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান! কানেও শুনিনি তখন ও সব কথা।

একপেট কয়লা আর জল খেয়ে ট্রেণ ছুটে আসছে কলকাতায়। কালীঘাটে কালীমাকে দর্শন করতে বাড়ী থেকে এসেছিলাম নৌকা পথে খুল্‌না ঘাট পর্যন্ত। তারপর ট্রেণে। সারা জলপথটাই তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ করেছেন, কিন্তু ট্রেণে চেপে মুখ খুলেছেন। দিদিমার আনন্দ কত? জীবনে প্রথম রেলগাড়ী চেপে বসেছেন তিনি—আসছেন কোথায়? না, কালীঘাটে তীর্থ করতে। মিনিটে মিনিটে হাতজোড় করে কপালে ছোয়াচ্ছেন আর বলছেন—সবই'ত মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। তিনি না ডাকলে কি আর যাওয়া হয়! বড় পুণ্যের কাজ করলি ভাই শিবু—

আঁধারের মাঝে পথিক যখন আলো আলো করে হাতড়ে বেড়ায়,—ঠিক তখন তার হাত ধরে যে আলোতে পৌঁছে দেয় সেই'ত পুণ্যের কাজ করে। তুই আজ সেই পুণ্য সঞ্চয় করলি শিবনাথ। আমার পরম উপকার করলি। আমার এই দেহ-খাঁচাটাকে গঙ্গায় দিতে পারলেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়—মা যেন আমার এ বাসনা পূর্ণ করেন।

ট্রেণ এসে থেমেছে শিয়ালদহ ষ্টেশনে। গায়ে তসরের চাদর জড়িয়ে,—ছোট কাপড়ের পুঁটুলী বগলদাবায় করে, দিদিমা নামলেন ট্রেণ থেকে। নুইয়ে পড়া দেহটার ভার বইবার জন্য একগাছি লাঠির সাহায্য নিয়ে তিনি এগিয়ে চল্‌লেন ধীরে ধীরে।

সেই আমার দ্বিতীয়বার ক'লকাতায় আসা। প্রথমবার এসেছিলাম বাবার সাথে, ছেলে বেলায়। দিন সাতেক ছিলাম তখন।

॥ বাইশ ॥

লোহার রেলিং।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের এপাশে রেলের ইঞ্জিন হাপাচ্ছে হাঁই-ফাঁই করে—আর ওপাশে চেঁচাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। কাপড় পরা, লুঙ্গীপরা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা—বিচিত্র পোষাকের বিচিত্র 'লোক। সকলের একই চীৎকার ,কালীঘাট, কালীঘাটে যাবেন, কালীঘাটের কালীদর্শন করুন—'

বিভিন্ন গাড়ীর চালক এরা, তবে বেশীর ভাগ ঘোড়ার গাড়ী। গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা—সওয়ারী এলেই দৌড়বে কালীঘাটের দিকে। কালীঘাটের পাণ্ডাদের দালালী করে এরা। কোন প্রকারে তাদের যাত্রী পৌঁছে দিতে পারলেই দালালী পাবে। তাছাড়া গাড়ীর ভাড়া'ত আছেই।

শহর কলকাতায় পাল্‌কার নতুন রূপ দেখে দিদিমা ভারী খুসী হলেন। বললেন, এখানকার লোকদের কত দয়া। পালকিগুলো মানুষে কাঁধে করে না, ঘোড়ায় টানে। হবে না! হবেইত। এযে মায়ের স্থান—মা যে করুণাময়ী।

কিছুকাল পূর্ব্বেও কোলকাতায় এসব পাট ছিল না—বল্‌লাম দিদিমাকে। এককালে এখানে মানুষের কাঁধে চড়া পাল্‌কীই ছিল সম্বল। সাহেব-সুবোরা পাল্‌কী চড়েই চলাফেরা করত। এদেশে এসে তাদের পালকী চড়া শিখতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম ভারি কষ্ট হোত তাদের। পাল্‌কী-বাহকদের হুন্‌না হুন্‌না গান শুনে ভয়ে আঁত্‌কে উঠে পালকী থেকে লাফিয়ে পড়তেন মাটিতে।

পাল্‌কী চড়ার মধ্যে সেকালে অনেক বাদবিচার ছিল। ঝালড় দেওয়া পাল্‌কীতে চড়বে উঁচুপদের লোকেরা—রাজকর্ম্মচারী, সরকারী লোক—এঁরা সব। আর সাধারণ পাল্‌কী চড়বে সাধারণ লোকেরা।

নবকৃষ্ণ মুন্‌শী যখন সাধারণ লোক ছিলেন, তখন সাধারণ পাল্‌কীই চড়তেন তিনি। যখন অসাধারণ হলেন অর্থাৎ মহারাজা খেতাব পেলেন তখন'ত আর সাধারণ পাল্‌কী চড়া যায় না! তখন তাঁকে ঝালড় দেওয়া পাল্‌কী চড়তে হবে। সরকার বাহাদুরের কাছে এই পাল্‌কী চড়ার অনুমতির জন্য নবকৃষ্ণকে হাত কচ্‌লাতে হয়েছিল।

আজকের মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কলকাতা ছিল না। কলকাতার তখন উঠতি বয়স। সবে মাত্র সাজান-গোছান সুরু করেছে। কতই বা বয়স এই শহরের। যে রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ীটা কালীঘাটের দিকে যাচ্ছে এই রাস্তাটার নাম কি জান-দিদিমা? এই রাস্তাটার নাম সারকুলার রোড্। শহর তৈরীর সুরুতে ছিল এটা এক মস্ত বড় খাল। হাতে কাটা খাল।

জান দিদিমা, বর্গীরা যখন কলকাতা আক্রমণ করতে আসে তখন পথে বাধা সৃষ্টির জন্য এ খালটা কাটা হয়েছিল। বাগবাজার থেকে ইন্টালী পর্য্যন্ত। তারপর আর কাটা হয়নি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেটিকে আবার বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বোজা-খালের উপর দিয়েই পায়-হাঁটা রাস্তা ছিল। তারপর একদিন ট্রাম লাইন পাতা হোলো।

বর্গীরা তখন এসেছিল কালীঘাটের কালীমন্দিরে লুঠপাটের আশায়।

"তাই নাকি?"

হ্যাঁ দিদিমা, তারা এসেছিল বটে,—কিন্তু লুঠ করে নি। মাথা নত করে মাকে প্রণাম করে ফিরে গিয়েছিল তারা। কালীঘাটে পৌঁছে সে কাহিনী শোনাবো তোমাকে। দিদিমা শুনছেন মনোযোগ দিয়ে। যত শোনেন তত অবাক হন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন তিনি— কত সব বিচিত্র জিজ্ঞাসা।

দেখ দিদিমা চেয়ে দেখ,—এই যে রাস্তাটা বরাবর চলে গেছে

পশ্চিম দিকে ; এটার নাম ক্রীক্ রো। এটাও মস্তবড় খাল ছিল। হেষ্টিংসের ধারে গঙ্গা থেকে সোজা বেরিয়ে একেবারে ধাপার কাছে সমুদ্রের খাড়ীতে গিয়ে মিসেছিল। এতবড় খাল ছিল যে, সেকালে বড় একখানা জাহাজ ডুবে গিয়েছিল এই খালের জলে।

বৃদ্ধা দিদিমা যেন নতুন করে কথা শিখছেন। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিকে দেখেন আর প্রশ্ন করেন ভূরি ভূরি। এটা কিরে? ওটা কিরে শিবু?—এ রাস্তাটার নাম কি বল্লি?—ধর্ম্মতলা!

—হ্যাঁ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

কোন এক কালে ধর্ম্মঠাকুরের আধিপত্য ছিল এ অঞ্চলে—আজ তার কোন চিহ্ন নেই,—আছে নামটা। ক্রীক্ রো'র খালের পাড়ে বর্ত্তমান ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের আশে পাশে ছিল ধর্ম্মঠাকুরের বহু মন্দির। ছোট, বড়, মাঝারী বহু আকারের বহু মন্দির আগলে বসে থাকত দেআসীরা। মন্ত্র তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক জলপড়া, চা'লপড়া দিয়ে বেশ ছু'পয়সা উপায় হত তাদের।

কুর্ম্মদেবতা ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্মরাজকে যমরাজ বলে অনেকে। হাঁড়ী, বাগ্‌দী, ডোম, মাল, বাউড়ী, জেলে, তাঁতি,ছুতর, কর্ম্মকার এরাই হোলো ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের সেবাইত। শিবজ্ঞানে অনেকে পূজো করেন ধর্ম্মরাজকে।

বড় মজার ঠাকুর ইনি। একা একা পূজো নিতে এঁর মন বোধ হয় কেমন করে। ছু'চার জন দেব-দেবীকে সঙ্গে নিয়ে বসে পূজো গ্রহণ করেন ইনি। পূজোর উপকরণ আরো মজার। পোড়ামাটির তৈরী হাতিঘোড়া পুতুল দিয়ে পূজো পেলে ভারী খুসী হন তিনি। ধর্ম্মরাজের সম্মুখে পাঠা বলিও হয়, আবার হরির লুঠও হয়। রাম আর রহিম—সবাইকে ভালবাসেন, সবাই তাঁর প্রিয়।

দেব আর দেআসী। ধর্ম্মরাজের সেবাইতকে দেব অংশি বা দেআসী বলে। দেআসীরাই যেন দেবতার অংশ এমনই নাম করণের

কায়দা। এঁরা নিজেরাই পুরোহিতের কাজ করে থাকেন—আবার ব্রাহ্মণ রেখেও পুজো করান মাঝে মাঝে। মূল দেআসী যিনি, তিনি মজাকরে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ঠাকুরের উপস্বত্ব ভোগ করেন—আর কবিরাজী করেন সরল বিশ্বাসী লোকেদের কাছে। পেট ব্যথার ওষুধ, বাতের ওষুধ, জল পড়া, ধুলোপড়া, তাগা-তাবিজ দেওয়ার বেসাতি'ত আছেই।

—ধর্ম্মরাজের মন্দিরের সামনে গাড়ীটাকে দাঁড় করা ভাই শিবু—ধর্ম্মরাজকে একটা প্রণাম করে নিই—দিদিমা ব্যগ্র হয়ে অনুরোধ করলেন আমাকে।

—মন্দির কি আর আছে দিদিমা? এদেশে ইংরেজ আসার সাথে সাথে সে সব মন্দিরের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে। যখন মন্দির ছিল,—তখন ভক্তরা দলে দলে আসত ধর্ম্মতলাতে গাজনের নাচ করতে।, বলে,—ধর্ম্মরাজের গাজন। মোটা সুতোর একগোছা পৈতে গলায় দিয়ে, হলদে রঙের কাপড় পরে, গায়ে নতুন গামছা জড়িয়ে চীৎকার করে বলত—"জয় বাবা ধর্ম্মরাজের জয়"। তারপর শুকনো বাব্‌লা কাঁটার উপর লাফিয়ে পড়ে কস্‌রৎ দেখাত নানা রকমের। বলে, বাবার মাহাত্ম্য থাকলে বাব্‌লার কাঁটা কেন—লোহার কাটাও অঙ্গ স্পর্শ করে না। নাচের সাথে সাথে ঢাকঢোল বাজতে থাকে—বাজনা যত বাজে নাচ তত দ্রুত হয়। নাচতে নাচতে চলে যায় সন্ন্যাসীরা কালীঘাটে বাবা নকুলেশ্বরের চরণে।

অনেকে বলেন,—ধর্ম্মরাজের গাজনটাই আজকাল শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। ধর্ম্মরাজের রূপান্তর ঘটেছে শিবলিঙ্গে। কালীতলা, শীতলাতলা, ষষ্ঠীতলার মত ধর্ম্মতলার নামটাও বেঁচে আছে আজও। মন্দিরের চিহ্নই নেই আশে পাশে কোথাও—আছে জাঁকজমক-পূর্ণ রাজপথ—তাঁর নাম স্মরণ করে! দেআসীরা ছড়িয়ে আছেন ধর্ম্মতলার আশে পাশে ডোমপাড়ায় হাঁড়ী-পাড়ায়।

যা বল্‌লাম্ দিদিমা বুঝলেন তার অনেক বেশী। বললেন,—আহা,

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী যেখানে—সকল পাপ-হরা গঙ্গা যেখানে বয়ে চলেছে সেখানে যে একটা কীটপতঙ্গও মরে উদ্ধার পেয়ে যাবে। মানুষ এখানে ম'রে উদ্ধার হবে না'ত হবে কোথায়?—আমার দেহটা যেন কালীঘাটের গঙ্গায় দিতে পারি এই আমার বাসনা। এইটুকু পূর্ণ কোরো মা কালী।

চৌরঙ্গী রোড ধরে আমাদের গাড়ী চলেছে ভবানীপুরের দিকে। সেখান থেকে আরো খানিকটা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেই কালীঘাটের কালীমন্দির।

চওড়া পাকা বড় রাস্তা—একদিকে মস্ত মস্ত পাকাবাড়ী, আর একদিকে ফাঁকা মাঠ।

দিদিমা বল্‌লেন,—তেপান্তরের মাঠ।

—হ্যাঁ, দিদিমা এটা তেপান্তরের মাঠই বটে,—নাম গড়ের মাঠ! কিছুকাল পূর্ব্বে এটা ছিল মস্ত বড় গভীর জঙ্গল; সুন্দর বনের অংশ ছিল এটা। এ জঙ্গলে বড় বড় বাঘ,—ইংরেজরা যাকে বলত রয়েল বেঙ্গল টাইগার—সেই বাঘ ছিল। গণ্ডার, ভল্লুক, হরিণ অনেক রকম জন্তুর সাক্ষাৎ মিলত এখানে। পুব দিকের ঐ যে বড় বড় বাড়ীগুলো দেখছ—ওগুলোও কিন্তু ছিল না সেকালে। এই রাস্তাটাই হচ্ছে সেই আদিকালের সাক্ষী। পা'য়ে হাঁটা সরু রাস্তা ছিল এটা, বাগবাজার থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত। এই পথ ধরেই কালীঘাটের কালীদর্শন করতে আসত দর্শনার্থীরা। মানুষের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছিল পথটা—তাদেরই প্রয়োজনে। শহর পত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে সেকেলে সেই মেঠো পথ চওড়া হোলো—বাঁধাই হোলো।

জঙ্গল ছিল গঙ্গার দিকে গভীর বেশী—আর এই দিকে ছিল কাঁচা মাটির বাড়ী, হালকা বসতি। শিকারীরা জঙ্গলের ভিতর ঢুকত শিকারের আশায়। গভর্ণর হেস্টিংস্‌ সাহেবের যুগেও এ জঙ্গলটা বেশ বড় ছিল। স্থানের নাম ছিল গোবিন্দপুর; ওপাশ থেকে এদিক পর্য্যন্ত

টানা অনেকখানি। জঙ্গলটা সুন্দরবনের অংশ হলেও অনেকে বলত গোবিন্দপুরের জঙ্গল। তা' হেষ্টিংস্ সাহেব এই গোবিন্দপুরের জঙ্গলে হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকার করেছেন, হরিণ শিকার করেছেন অনেক।

এ জঙ্গলে যেমন বাঘ ভল্লুকের ভয়, তেমন সাধু সন্ন্যাসী, লেঠেল, ঠ্যাঙ্গাড়ে ডাকাতের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। চৌরঙ্গী-গিরি নামে এক সন্ন্যাসীর আখড়া ছিল ঐখানে—যেখানটায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া-শ্বেতমর্ম্মর স্মৃতি-সৌধ দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ঐ স্থানটায়। ইংরেজরা এসে এসব ভেঙ্গে চুরে পরিস্কার করে ঐ স্মৃতি-সৌধ গড়েছে।

নাথ-যোগী ছিলেন চৌরঙ্গী-গিরি-সন্ন্যাসী। জটাজুটধারী, কানে কণ্ডুল, গলায় আর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, সম্মুখের মাটিতে পোঁতা খন্তা আর ত্রিশূল। পরণে রক্তবর্ণ কৌপীন, গলায় ঝুলছে শঙ্খের মালা, তার সাথে নাদ বা শিঙ্গা।

নাদ্ বা ধ্বনি অবলম্বন করে তাঁরা সাধনা করেন। পথিকেরা মাঝে মাঝে দিন-দুপুরে যখন চলত এই পথ দিয়ে—তখন তারা শুন্‌তে পেত শঙ্খ বা নাদের আওয়াজ।

নাদ্-রূপ মহাশক্তি জগৎ-রূপে প্রকাশিত। নাদের জ্ঞান না হলে জগতের জ্ঞান হবে কি করে? নাদ বা ধ্বনি অবলম্বন ক'রে নিজের অভিব্যক্তি কামনা করেন নাথ-যোগীরা।

বড় কঠিন সাধনা। সাধক প্রথম অবস্থায় সাগরধ্বনি, মেঘ-গর্জন, ভেড়ীর আওয়াজ সবই শুনতে পান। যখন তিনি মধ্য অবস্থায় উপনীত হন তখন ঐ সব বিরাট ধ্বনি—ঘণ্টাধ্বনির মত শোনায়, তারপর যখন অন্ত অবস্থায় পৌছান,—প্রাণবায়ু ব্রহ্ম-রন্ধ্রে সুস্থির হয়ে যায়, তখন আর কোন আওয়াজ সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হয় না। বিরাট আওয়াজ ভ্রমর গুঞ্জনের মত শোনায়।

অদ্ভুত ক্ষমতা এই সব নাথ-যোগীদের। যোগ বলে নিজেদের জীবনী-শক্তি বাড়িয়ে নিতেন সন্ন্যাসীরা। এই যোগ বলে তাঁরা দেড়'শ দু'শ বৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতেন বলে শুনেছি।

কোথায় গেল সে জঙ্গল আর সন্ন্যাসীর আশ্রম? শহরকে সাজাতে গোছাতে তাকে কেটেকুটে ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিয়েছে। অতীতের সেই সন্ন্যাসীর নাম বুকে করে শুয়ে পড়ে আছে—আজকের এই "চৌরঙ্গী রোড।"

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দিদিমা। বললেন—কী ছিল, আর কি হোল? স্বপ্নময় মনে হয় সব কিছু। মায়ের স্থান যদি সাজানো গোছানো না হয় তবে আর হবে কোথায়?—আর কতদূর রে শিবু? দিদিমার ব্যাকুল প্রশ্ন।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ী ত বেশ জোরেই চলেছে দিদিমা—এইত ভবানীপুর এলাম তার পরই কালীঘাট—একেবারে কালী মন্দিরের কাছে। বেলা আটটার মধ্যেই আমরা পৌছে যাব।

—দেখ দেখ মজার জিনিস দেখ শিবু—গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখবাড়ীয়ে দিদিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখে দিদিমা আশ্চর্য্য হয়েছেন। এমন কত জিনিস দেখবে দিদিমা কালীঘাটে গিয়ে। কালীঘাটে গিয়ে যেমন দেখবে, তেমন শুনবে অনেক কিছু।

ফোকলা মাড়ী বার করে দিদিমা হাসছেন খিল্ খিল্ করে। ট্রামের মানুষগুলোর ওঠা নামা দেখে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্ছে মানুষ-গুলো আবার তড়াক করে লাফিয়ে নামছে তাড়াতাড়ি।

ট্রামের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের ঘোড়ার গাড়ী এসে পৌছল কালীঘাট রোড ধরে—কালীক্ষেত্রে কালীমন্দিরের কাছে।

॥ তেইশ ॥

মন্দিরের কাছ বরাবর উত্তর পশ্চিম দিকে একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ালো আমাদের গাড়ীটা। গাড়ীর দরজা খুলে গাড়োয়ান ডাকলে আমাদের—বাবু এই কালীঘাট,—বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের প্রসিদ্ধ যাত্রী-নিবাস।

—কথা শুনেই দিদিমা হাত জোড় করে প্রণাম করলেন বার কয়েক কালী মন্দিরের চুড়ো লক্ষ্য করে। গাড়ীর গাড়োয়ানের চোখের ইসারায় পাণ্ডা ঠাকুর নেমে এলেন হাসতে হাসতে। দিদিমার হাত ধরে গাড়ী থেকে নামালেন তিনি। আসুন মা ভেতরে আসুন—বলে, সম্ভাষণ করলেন বাঁড়ুয্যে মশাই।

ভুবন বাঁড়ুয্যের যাত্রী নিবাস। বাঙ্গালী সাধারণ যাত্রীরা এসে ওঠেন এখানে। কিছু সংখ্যক যান হালদার বাড়ী। এ ছাড়া আরো গোটাকতক ভাল যাত্রী নিবাস আছে এপাশে ওপাশে। এপাশে অনন্ত চৌধুরী, বেনী চৌধুরী। ওদিকে কালীচরণ পাণ্ডা। বেশ নাম ডাক তাঁর কাশীর পাণ্ডার মত। আসল নাম কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়। পাণ্ডাগিরি করতে করতে আসল পদবীটা ধুয়ে মুছে গেছে একেবারে।

যাত্রী-নিবাসের মালিক ভুবন বাঁড়ুয্যে দিদিমার হাত ধরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি-বেয়ে উপরের ঘরে নিয়ে এলেন। পশ্চিম দিকের আলো বাতাস-যুক্ত একটা ঘরে আমাদের স্থান করে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বেশ ঘরটি—জানলা খুলে পূব দিকে চোখ ঘোরালেই নজর পড়ে মায়ের সম্পূর্ণ মন্দিরটার উপর।

এ ঘরটা সম্পূর্ণ আপনারা ব্যবহার করবেন মা জননী। এ ঘরে আর অন্য যাত্রী আসবে না। সবাইয়ের জন্য এঘরটা নয়। খুব ভাল সাত্ত্বিক যজমান না হলে এ ঘর বন্ধ থাকে।

—কারণ?

কারণ বিশেষ কিছুই নয়—আম্‌তা আম্‌তা করে হাস্‌তে লাগলেন বাঁড়ুয্যে মশাই। এই 'কারণের' উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। যাত্রীকে খুসী করবার জন্য বোধ হয় ও কথাটা সকলের কাছে ব্যবহার করে থাকেন।

যাই হোক—খোলাঘর পেয়ে দিদিমা যেমন খুসী হলেন, তেমন খুসী হলেন বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের ব্যবহারে। মায়ের মন্দিরকে লক্ষ্য করে হু'হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ালেন, বললেন,—তোমার কৃপা না হলে কি আমার আসা হোত মা? তোমার অশেষ করুণা।

বোঁচ্‌কা-বুঁচকি খুলে কাপড়-চোপড় বার করে গঙ্গা-স্নানের আয়োজন করতে লাগলেন তিনি। পাণ্ডা বাঁড়ুয্যে মশাই লোক পাঠালেন গঙ্গা স্নানে তাকে প্রয়োজনে লাগবে কি না?

—হলে'ত ভালই হয়। বললেন দিদিমা।

হেসে হেসে উত্তর দিল লোকটি—সেই কথাই বাঁড়ুয্যে মশাই বললেন,—রতন, মাঠাক্‌রুণকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে নিয়ে এস;—নতুন জায়গা কোন কিছুই তাঁর জানা নেই। তাই'ত মাঠাক্‌রুণের কাছে······

রতনের পিছু পিছু বাঁড়ুয্যে মশাই দেখা দিলেন হাসিখুসী মুখ করে। সঙ্গে করে এনেছেন একটি চোদ্দ পনের বছরের মেয়েকে। বৃদ্ধ পাণ্ডা মশাইয়ের গা' ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি মাথা নীচু করে।

—আমার এই জননীটিকেও গঙ্গাস্নানে পাঠাব আপনার সাথে—মৃদু হেসে বললেন বাঁড়ুয্যে মশাই। তারপর হুকুম করলেন রতনকে—মা বুড়ো মানুষ, খুব সাবধানে হাত ধরে ঘাটে নামাবে; কোন রকম কষ্ট হয় না যেন মায়ের। হাতজোড় করে বিনীতভাবে বললেন দিদিমাকে—কোন অসুবিধা বোধ করলে দয়া করে জানাবেন এই বুড়ো ছেলেটিকে। বলে, হাসতে লাগলেন ভুঁড়ি কাঁপিয়ে।

গোলগাল চেহারা—কেশ-বিরল মস্তক—গায়ে ফতুয়া। শ্যামবর্ণ

দেহ। দেহের যে অংশটা ফতুয়া দিয়ে ঢাক্‌তে পারেন নি সেটি তাঁর বৃহৎ ভুঁড়ি।

আর একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো যাত্রী-নিবাসের ফটকে—দোতালা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তিনি, তারপর খড়মের আওয়াজ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

চল হে রতন ঠাকুর, আমাদের গঙ্গা স্নান করিয়ে আনবে চল। গঙ্গার স্নানের জন্য দিদিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কামারের ছেলে রতন,—দিদিমার কথা শুনে চমকে উঠল। জিভ্‌-কাটা খেয়ে বললে—বল কি মাঠাক্‌রুণ? ও কথা বলে আমার অকল্যাণ কোরো না। আমি জাতে কামার, ঠাকুর হব কি করে? জাত ভাঁড়িয়ে যে বামুন সাজে সাজুক—আমি কামারের ছেলে কামারই থাকব। আপনাদের সেবার জন্য পড়ে আছি মায়ের চরণে। ভালবেসে আপনারা যে যা দেন তাতেই আমার চলে যায়। মাসকাবারে বাঁড়ুয্যে মশাই দেন নগত পাঁচ টাকা, এতেই আমার কুলিয়ে যায়—কোন অভাব নেই মাঠাক্‌রুণ! অভাব হবে কেন? মায়ের চরণ তলে আছি না!

—ওকি! তুমি কাঁদছ?—দিদিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মেয়েটির দিক চেয়ে। ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মেয়েটি। তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখটিকে উঁচু করে তুলে ধরলেন দিদিমা।

সুন্দর নিটোল মুখ। বহু কেঁদে মুখটিকে ফুলিয়েছে।—কাঁদছ কেন, কি হয়েছে তোমার? দিদিমার স্নেহমাখা প্রশ্ন। আঁচলে মুখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ল সে—কান্নার ফোঁপানি আরো বেড়ে গেল।

বাইরের বারান্দায় বসে মুড়ি চিবুচ্ছিল বছর আষ্টেকের একটি ছেলে,—তাড়াতাড়ি সে ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লে—ফের কাঁদছ পিসিমা? কাকা এসে কিন্তু আবার বক্‌বে।

—কোথায় গেছেন তোমার কাকা—প্রশ্ন করলাম আমি।

চট্‌পট্‌ উত্তর দিল ছেলেটি—পুরুৎ ডাকৃতে। আজকে যে কাকার সাথে পিসিমার বিয়ে হবে—

তাই নাকি—দিদিমা হাসতে লাগলেন বটে,—আমি কিন্তু যথেষ্ট অবাক হলাম।

জানলার ধারে একখানা ভাঙ্গা চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি—আর ভাবছি কেন কাঁদছে মেয়েটি—অবৈধ বিয়ে? জবরদস্তি বিয়ে করছে কি লোকটি?—কি বলতে চায় ও মেয়েটি? শুধু কান্না আর কান্না। কান্নাই কি ওর সব কথা! কালীঘাটে এসেছিলাম কালীদর্শন করতে—দর্শন করছি মায়ের অনন্ত লীলা। নোটবুক বার করে লিখতে সুরু করলাম ঘটনাগুলো।

বীরু তোর পিসিমা কোথায় রে?—বলতে বলতে ঢুকলেন একজন আধাবয়সী লোক। আমাদের ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বীরুর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, দিদিমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন—মা পেয়েছে বুঝি?—তা বেশ বেশ।

বীরু বল্‌ল,—পিসিমা বড্‌ড বেশী কাঁদছে কাকা—

—কাঁতুক, কাঁতুক, কত কাঁদবে?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ভদ্রলোকটিকে—বয়স তিরিশ পঁয়তিরিশ হবে। কানের পাশ দিয়ে বেশ কয়গাছি চুলের পাক ধরেছে—সামনের নীচেরদিকে একটা দাঁত ফোক্‌লা,—নাকের নীচে খানিকটা গোঁপ, গালে কাঁচা পাকা দাড়ি বোঝাই। আপন মনেই তিনি বলতে লাগলেন,—মা হারা মেয়ে ভাইয়ের সংসারে মানুষ। আজ মা পেয়েছে তাই কেঁদে কেঁদে সব কথা বলছে মায়ের কাছে। থাকুক কিছুক্ষণ মায়ের কাছে—মা পেয়ে সব দুঃখ ও ভুলে যাবে। আমি চট্‌ করে ঘুরে আসি,—এগুলো এখানেই থাক। বলে, নতুন গামছায় বাঁধা একটি পোটলা, শোলার টোপর, দুখানা নতুন কাপড় ইত্যাদি টুকি টাকি জিনিসপত্রগুলি আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় বসে গোছাতে লাগলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নাঃ, আগে দাড়িটা কামিয়ে আসি চট্ করে। পাণ্ডা মশাইকে বলে দিয়েছি ওপাশের ঘরটা পরিষ্কার করে দিতে—পুরুৎ মশাই এসে যাবেন ঘণ্টা খানেকের মধ্যে—এলেই বসে পড়তে হবে—

বল্‌তে বল্‌তে নীচের দিকে চলে যাচ্ছিলেন তিনি—জানালার ফাঁক দিয়ে চোখো-চোখি হয়ে গেল আমার সাথে। হেঁসে ফেললেন তিনি—দাঁত বের করে। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন—নমস্কার। কালীদর্শন করতে বুঝি ?—বেশ বেশ, মাকে নিয়ে এসেছেন বুঝি তীর্থ করতে ? খুব ভাল কথা !

—বল্‌লাম,—উনি আমার মায়ের মা।

—নিবাস ? থাকা হয় কোথায় ?

বল্‌লাম—পূর্ববঙ্গে।

ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। পোঁট্‌লা পুঁট্‌লীগুলো আবার গোছাতে সুরু করলেন, তারপর আধখানা হাসি হেসে বললেন—একেই বলে তীর্থ করা। পাপ করলেই পুণ্য করতে হয়—অন্ধকার হলেই আলোর দরকার। পাপ ছিল বলেই'ত লোকে পুণ্য করে। এটাই ভগবানের কেরামতি। আমার মশাই তীর্থ-টীর্থ কিছু নয়। পাপ'ই করলাম না জীবনে তা' পুণ্য কিসের ? আমি এসেছি বিয়ে করতে—বলে বেচারা আবার হাঁসলেন, তারপর বল্‌লেন, তবে হ্যাঁ,—বাড়ী ফেরার পথে একবার দর্শন করে যাব ভাবছি।—আজ আমাদের বিয়ে—কাপড় চোপড়, টোপর গামছা সবই কেনাকাটা হয়ে গেছে—পুরুৎ মশাই এসে গেলেই······পাত্রীটিকে দেখেছেন নিশ্চয়ই—এক গাল হেঁসে প্রশ্ন করলেন আমাকে। হাঁসি সাম্‌লে বললেন,—ঐত মায়ের কাছে বসে আছে।

অনর্গল বকে চলেছেন ভদ্রলোক। কখন আপন মনে কখনও আমাকে উদ্দেশ করে। আমার কৌতূহলকে খোঁচা দিচ্ছিলেন তিনি। প্রশ্ন করলাম—এটা'ত মল মাস, এ-মাসেতে কোন বিয়ে নেই—তাছাড়া

এখানেই বা এভাবে বিয়ে হবে কেন? আপনার লোকজন আত্মীয় স্বজন সব কোথায়?

—কি দরকার মশাই আত্মীয় স্বজন লোকজন ডেকে জানাজানি করে—অপকার ছাড়া উপকার করবে না কেউ। বয়স দোষে না হয় একটা অন্যায় করেই ফেলেছি—তার কি কোন রেহাই নেই?

চুপ করে শুনছি ভদ্রলোকের কথা। যা প্রশ্ন করেছিলাম তার যথেষ্ট বেশী উত্তর দিলেন। আমার আর কোন প্রশ্ন আছে কি না নিজের মনেই আলোচনা করে দেখছিলাম—সে চিন্তাসূত্রে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক আবার বলতে সুরু করলেন—

আমি মশাই হাওড়া পাট কলে কাজ করি। নাম ধীরেন দাশগুপ্ত। ওদের বাড়ীতেই থাকতাম। চটকলের 'হপ্তা' পেলে সবটাই ধরে দিতাম ওদের সংসার খরচার জন্য। তিনকুলে আমার কেউ নেই—থাকার মধ্যে ঐ পাত্রীটির সাথে একটু সামান্য আত্মীয়তা হয়ত আছে।

পাত্রীটি আমার মামাতো ভাইয়ের খুড়তুতো বোন—কেউ নেই ওর। শিশু বয়স থেকেই ওদের ওখানে মানুষ। অভাব অনটনের সংসার।

চটকলের হোটেলেই খেতাম,—সেখানেই শুয়ে থাক্‌তাম। কোন কষ্টই ছিল না আমার। মামাতো ভাই বিষ্টুচরণ আমাকে ডেকে নিয়ে এলো সেখান থেকে—বল্‌লে—হোটেলে থাকবি কেন, আমাব এখানে থাক। খরচাটা না হয় আমাকে দিস।···একদমে কথাগুলো বলে একটা ঢোক গিললেন তিনি। তারপর বললেন,—সেদিন ভেবেছিলাম, ভাই আমার উপকার করল, আজ দেখছি শালা আমার সর্ব্বনাশ করেছে।—একটা ফাঁদ পেতে মেয়েটাকে তার আধার করে দিল। বয়স দোষে আমি.ফাঁদে পড়ে গেলাম।—

এই পর্য্যন্ত বলে তিনি চুপ করলেন। আমিও চুপ করে আছি। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছি বেচারীর কথা শুনতে শুনতে।—তারপর?

তারপর আর কি ? টাকা ; টাকা ছাড়ো মান ইজ্জত সব পাবে—বিষ্টুচরণ আমাকে বোঝালে খুব ভাল করে ! তাই বুঝে মশাই আমার জমানো টাকাগুলো সব খরচ করলাম। সব টাকাটাই ধরে দিলাম বিষ্টু রায়ের হাতে। তাতে কি রেহাই আছে ? রোজ রোজ সেই একই কথা। "টাকা ছাড়ো"—

পুরুষের বাচ্চা আমি—বললাম সবিতাকে বিয়ে করব—টাকা খরচ করতে হয় সবিতার জন্য করব—তার পেটের বাচ্চার জন্য করব—তোমার হাতে এক সিকি পয়সাও দেব না, চামার।—আমার মাথায় ভীষণ চিন্তা ঢুকল মশাই, ভাবলুম চামারটার হাতে যে টাকাগুলো দিই সেগুলো সে বাক্সবন্দী করে—তাতে মেয়েটার কি হবে ? তার বাচ্ছাটার কি হবে ? তাই চলে এলাম কালীঘাটে। বিষ্টু কসাই বলে'ত আমি কসাই হতে পারি না ! সবিতার হাত ধরে যখন বেরিয়ে এলাম তখনও বিষ্টুর সংসার খরচা বাবদ দু'কুড়ি টাকা গুণে দিয়ে এসেছি।—এখানে এসেছি পুরুৎ ডেকে মন্তর পড়ে ওকে আজ বিয়ে করব।...মাকে বলুন না দাদা ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিন। কোন কষ্ট থাকবে না ওর। আমি বিষ্টু রায় নই—আমি পুরুষের বাচ্চা ধীরেন দাশগুপ্ত।

লজ্জার কি আছে ? অন্যায় করে'ত পালিয়ে যাচ্ছি না। বিয়ের পর কাশী চলে যাব। সেখানে একটা কাজ কর্ম্ম জুটিয়ে নিতে পারব। কালীঘাটে যখন এসেছি—তখন ছিঁটে ফোঁটা পাপ যদি কিছু থাকে, তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে—কি বলেন দাদা ?—বলে, হাঁসতে হাঁসতে বেরিয়ে গেলেন—যাই চট্ করে দাড়িটা কামিয়ে আসি।

॥ চব্বিশ ॥

এই অবসরে মেয়েটিও দিদিমাকে পেয়ে বসেছে। তাঁর গা ঘেসে বসে জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে সবিতা।

দিদিমা ডাকলেন—ওমা, উঠে আয় চল, যাই—গঙ্গার স্নানটা সেরে আসি চ। গঙ্গায় তিনবার ডুব দিলে সব পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। এ-যে কালীক্ষেত্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু, শিব-কালী—গঙ্গা যেখানে—সেখানে এসে গঙ্গায় ডুব দিলে পাপ মুক্ত হবে না'ত হবে কোথায়?

দিদিমার সাথে সবিতা গঙ্গায় ডুব দিল তিনবার। মনে মনে বোধ হয় সে একথাও বলেছিল, তোমার কোলে আমাকে টেনে নাও মা গঙ্গা।

স্নান সেরে উঠলেন দিদিমা আর সবিতা। ঘাটের পাণ্ডাদের কাছে বসে, দিদিমা চন্দন দিয়ে কালী নামের ছাপ লাগালেন দেহের কয়েক স্থানে। বাটী ভরা শ্বেত চন্দন ছিল পাণ্ডাদের কাছে। ধাতুর তৈরী কৃষ্ণচরণ তাতে ডুবিয়ে নিয়ে সবিতার কপালে পরিয়ে দিল ঘাটের পাণ্ডা।

এয়োস্ত্রী রমণীরা এসেছেন সিন্দুর কৌটো হাতে নিয়ে। এয়োস্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে নিজেদের সিথির সিঁদুর অক্ষয় করতে।

দিদিমার সিঁথিতে সিঁদুর দিচ্ছেন এয়োস্ত্রীরা। বলছেন—পাকাচুলে সিঁদুর পরা ভাগ্যের কথা—যেন মা ভগবতীর কপালে সিঁদুর দিচ্ছেন তাঁরা। তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে তাঁর সিথিতে, আর কপালে সিঁদুর দিতে। কে যেন সবিতার কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর লেপে দিল তাড়া-হুড়োর মাঝে—

দিদিমা বললেন—মা যে কল্যাণময়ী। মানুষের রূপ ধরে সেই কল্যাণময়ী তোর মাথায় সিঁদুর দিয়ে গেলেন। তোর পাপ মুক্ত হয়েছে সবিতা।

পতিত-পাবনী গঙ্গা তোকে পাপ মুক্ত করেছেন। তোর মনের কালীমা ধুয়ে দিয়েছেন তিনি। কাণ্ডার মুনির মত মহাপাপী যদি গঙ্গার স্পর্শ পেয়ে পাপ মুক্ত হতে পারে—তা'হলে তোর পাপেরও মুক্তি আছে। মনের ভক্তি রাখ—মনে জোর রাখ—

এইত সেই আদি গঙ্গা। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনির শাপে যখন হত হয়ে পড়েছিলেন—তখন এই গঙ্গাই তাঁদের শাপ মুক্ত করেছিলেন।

কপিলমুনি রোষানলে সগর পুত্র যখন ভস্ম হয়ে গেলেন তখন অসমঞ্জ পুত্র অংশুমান হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন—একি করলেন মহাঋষি? ক্রোধান্ধ হয়ে সগর বংশ নিপাত করলেন যখন—তখন তার মুক্তির পথ বলে দিন। তাদের উদ্ধার কিসে হবে—তার নির্দ্দেশ দিন।

মহামুনি শান্ত হলেন। বল্লেন—যদি গঙ্গা কখনও মর্ত্ত্যধামে আসেন তবে তার স্পর্শে সগর বংশ উদ্ধার হবে।

তারপর চল্ল গঙ্গার আরাধনা। সগর নাতি অংশুমান, ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার তপস্যায় মগ্ন হলেন। প্রার্থনা করলেন, মর্ত্ত্যধামে গঙ্গা অবতীর্ণা হোন—তাঁর স্রোতে সগর বংশ শাপ মুক্ত হবেন।

তপস্যা'ত তপস্যাই। সেই তপস্যায় অংশুমানের আয়ু ফুরিয়ে গেল। তারপর অযোধ্যা রাজ্য ছেড়ে এলেন তাঁর পুত্র দিলীপ—পিতার মত তাঁরও বুঝি আয়ু ফুরিয়ে যায় তপস্যা করতে করতে।

এদেকি রাজা গেছেন রাজ্যছেড়ে। অযোধ্যা নগরে সর্ব্বত্র অরাজকতা দেখা দিয়েছে ভীষণভাবে। দিলীপ পত্নীদ্বয়ের মনে দারুণ কষ্ট, দেশময় হাহাকার। রাজ্যবুঝি ছারখার হয়ে যায়।

এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার টনক নড়ল। তিনি চিন্তিত হলেন। পরামর্শ করলেন পুরন্দরবাসীর সঙ্গে। দিলীপ যদি এভাবে আমার তপস্যায় আজীবন কাটিয়ে দেয়—তবে সূর্য্যবংশ লোপ পেয়ে

যাবে। সূর্য্যবংশ যদি লোপ পেয়েই যায় তবে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হবে কোথায় ?

—তাই'ত বড়ই চিন্তার কথা !

দেবাদিদেব মহেশ্বর এলেন অযোধ্যায় দিলীপ পত্নীদের কাছে। বর দান করলেন জ্যেষ্ঠা পত্নীকে—"পুত্রবতী হও তুমি" !

সেই রাণী একদিন পুত্র প্রসব করলেন। পুত্র দেখে প্রসূতী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। এ কি পুত্র ! এ-যে থল্‌থলে মাংসপিণ্ড খানিকটা।

অস্থিমজ্জাহীন মাংসপিণ্ড কোলে করে জননী কাঁদেন—এ কি বরদান করলেন মহেশ্বর ! যাকে কোলেপিঠে করে নেওয়া যায় না এমন থল্‌থলে মাংসপিণ্ড নিয়ে আমি কি করব ?

অনেক দুঃখে ঠিক করলেন জননী সেই মাংসপিণ্ডকে সরযূ নদীতীরে রেখে আসবেন।—একদিন তিনি তাই করলেন। রেখে এলেন মাংসপিণ্ড শিশুকে।

অষ্টবক্রমুনি চলেছেন এই নদীতীর দিয়ে স্নান করতে। দেহ তাঁর অষ্টভঙ্গ। ভাঙ্গাচোরা দেহ নিয়ে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়। চলার পথে হঠাৎ নজর পড়ল ঐ বাঁকা চোরা জড় মাংসপিণ্ড সন্তানটির প্রতি।—দেখেই ক্রোধে ফুলতে লাগলেন তিনি। নিশ্চয়ই আমার ভাঙ্গা-চোরা-দেহ দেখে ব্যঙ্গ করবার জন্য অমন করে শুয়ে আছে শিশুটি।—যেমন ক্রোধ, তেমন অভিশাপ। অভিশাপ দিলেন—"ভস্ম হয়ে যাও তুমি।"—আর প্রকৃতই যদি এমন দেহ হয় তোমার তবে—"মম বরে হও তুমি মদন মোহন"—

শাপে বর হোলো। অস্থি-মজ্জা-হীন জড় মাংসপিণ্ড অস্থি-যুক্ত হয়ে মানব দেহ ধারণ করলেন। দিলীপ নন্দন উঠে দাড়ালেন। ভাগে ভাগে তাঁর জন্ম হলো—তাই তাঁর নাম ভগীরথ।

এই ভগীরথই গঙ্গাকে মর্ত্ত্যধামে আনায়ন করলেন। সে কি একদিনের চেষ্টায় ?—তিনিও ধ্যান করলেন আরো চল্লিশ বছর।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে ব'সে, শীতকালে জলে ব'সে তপস্যা করে তুষ্ট করলেন বিশ্বপতিকে।

বিশ্বপতি নারায়ণের আদেশে মন্দাকিনী গঙ্গা নেমে এলেন মর্ত্ত্যধামে —সগর বংশ উদ্ধার করতে। ভগীরথ আগেভাগে চল্‌লেন শঙ্খ বাজিয়ে, পাছে চল্‌লেন গঙ্গা।

পথ চল্‌তে চলতে কতশত পাপী-তাপীকে, কতশত অভিশপ্তকে মুক্ত করে কপিল মুনির আশ্রম দিকে চল্‌লেন তিনি। শাপভ্রষ্ট সগর পুত্রদের উদ্ধার করলেন—সাগরের সাথে সঙ্গম করলেন সেইখানে। সৃষ্টি হোলো "সাগর সঙ্গমতীর্থ"।

এত পাপী তাপীকে যে উদ্ধার করল—সে তোকে উদ্ধার করতে পারবে না সবিতা?

॥ পঁচিশ ॥

সাবিত্রী মূর্ত্তি নিয়ে বসে আছে এক ব্যক্তি। ঘাটের পথেই বসে বরাবর। যেমন ভীড় তেমন বসবার ব্যবস্থা—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। মুর্ত্তিটিকে নিয়ে এপাশে ওপাশে সরে বসে মাঝে মাঝে। মেয়েদের ঘাটের মুখেই বসে বেশী সময়।

এয়োস্ত্রীরা স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ভিজে মাথায় সাবিত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে, নিজের সিঁদুর দীর্ঘায়ু কামনা করেন সাধ্বী রমণীরা। স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন তাঁরা।

ডাকছে—আসুন মা, সাবিত্রীর কপালে সিঁদুর দিন—আপনাদের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হবে—মূর্তির পাশেই রাখা আছে সিঁদুরের বাণ্ডিল, তারের বালা, কড়ি-চুপ্‌ড়ি, আল্‌তা, কুম্‌কুম্‌ আরো অনেক কিছু। যাঁরা সঙ্গে করে আনেন নি এসব কিছু—তাঁরা এখান থেকেই কেনেন সিঁদুর আল্‌তা। সিঁদুর পরবার মন্ত্র আছে। সে মন্ত্র বলে দেয় মূর্তির মালিক। এই তাদের জীবিকা।

ভুবনেশ্বর গিরির জামাতা ভবানীদাস যখন যৌতুক স্বরূপ কালীমূর্তি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হলেন—তখন আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা সেই যে এসে বসলেন এখানে এক একটি বিগ্রহ নিয়ে সেই দিন থেকে সুরু হোলো তাদের জীবন-সংগ্রাম। বাঁচার তাগিদেই যে যার পথ বেছে নিলো তারা।

আজও তাদের বংশধরেরা রক্ষা করছে পৈত্রিক প্রথা। ডাকছে—যাত্রীদের, আসুন মা এদিকে আসুন। চরণামৃতের কুশি উঁচিয়ে আছে—যাত্রী এলেই হাতে দেবে দু'ফোঁটা। যাত্রী হাত পেতে চরণামৃত নেয় ভক্তি-সহকারে—তারপর তারা হাত পাতে আগ্রহ সহকারে। দু'পয়সা চার পয়সা যা পায় তাতেই তুষ্ট হয় তারা।

এসব লোক কথা বলে ভাল। যাত্রী বুঝে কথা বলে এরা। লাঠি ঠুকে ঠুকে আসছে দিদিমা সাবিত্রী মূর্তির দিকে। মূর্তির মালিক ডাকছে—আসুন মা আসুন—মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। এয়োস্ত্রীরা চেয়ে থাকেন দিদিমার দিকে—রাশি রাশি সিঁদুর লেপে দিয়েছে বৃদ্ধার সিঁথিতে। কাগজের মোড়কে সিঁদুর নিয়ে আসে এয়োস্ত্রীরা, দিদিমার পা'য়ে ছোঁয়াতে—দন্তহীন মাড়ী বার করে প্রথম প্রথম হাসলেন দিদিমা, তার পর রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

সবিতা কিন্তু ভীড়ের মধ্যে দিদিমার আঁচল ছাড়েনি। তার কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে অনেকে—দিদিমা চেয়ে দেখলেন,—দেখে হাসলেন প্রানভরে।

মৃত স্বামী কোলে নিয়ে বসে আছেন সতী সাবিত্রী। সতীত্বের জোরে যমরাজকে পরাস্ত করেছিলেন যে নারী—সেই নারী জগতে পূজিতা হচ্ছেন আদর্শ সতী হিসাবে।

রতন বোঝাচ্ছে দিদিমাকে—জান মা ঠাকরুণ, এই মূর্তি এখানে বসিয়ে দীনুদা চাট্টি খেয়ে পরে বাঁচ্ছে—আজকালত' একেবারে আয় নেই বল্লেই চলে। এককালে প্রচুর আয় ছিল দীনুদার। আমাদের খুবই পরিচিত লোক এরা। এদের অনেক খবর আমি জানি। পাশা-পাশি বাস করছি ত' সব। সে-কালের আয় দিয়েইত বেহালায় জমিজমা বাড়ীঘর তৈরী, তাদের অত সম্পত্তি। আজকালের যাত্রীরা একটা পয়সা কেন—একটা আধ্লাও ঠেকাতে চায়না। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে যায়। কিন্তু তখন মানুষের ভক্তি ছিল কত? এখানে এসে মাঠাকরুণরা স্নান করে নতুন কাপড় পরে সাবিত্রীর পুজো দিত। মানসিক থাকলে—তা' শোধ করত। স্বামীর অসুখ করেছে, নিরুদ্দেশ হয়েছে, অমনি চলে এলেন মাঠাকরুণরা সাবিত্রীর কাছে। রতন বোঝাচ্ছে,—আর দিদিমা বুঝ্ছে।

রতন বলে চলেছে, দীনুদা যাত্রীকে বলে দিল,—কোন ভয় নেই মা, সব ভাল হয়ে যাবে। মায়ের কাছে মানত্ করুন, মা'ই সব ভাল

করে দেবেন। যাত্রীরা মানত্ করত,—পরে এসে মানষিক শোধ করত। শাঁখা শাড়ী সবাই দিত; নাকের নথ, গলার সোনার হার, সোনার চুড়ি, টাকাপয়সা অনেক পেত তখনকার কালে। আজকাল মানুষের তত ভক্তিও নেই, আর···

রতন মহাবিজ্ঞের মত কথাগুলো বলছিল দিদিমাকে। বেশ লাগছিল আমার।—চল রতন বাড়ী ফিরে চল, সেখানে গিয়ে তোমার বহু কথা শুনব। তোমার কাহিনী শোনাবে আমাকে।

এগিয়ে চলেছি আমরা—আমাদের নিবাসের দিকে। দিদিমার হাত ধরে চলেছে রতন, তার পাশে সবিতা, আমি একটু পেছনে। রতন তার কথা বলে চলেছে—আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি জান মাঠাক্রুণ,যেবার দীনুদার বাবা নিতাই নস্কর এলো কালীঘাটে তখন কাজ কাজ করে সে ঘুরেবেড়ালো তিনদিন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিকেলে ফিরে আসত মায়ের-মন্দিরে ভোগ খেতে। রাত্রে একটা বাড়ীর রকে শুয়ে থাকত নিতাই কাকা। সেই বাড়ীর মালিক ছিলেন নিবারণ ভট্চায্যি। ঘোড়ার আঁস্তাবলের পূবদিকে ঐ যে বাড়ীটা—ঠিক সেইখানটায় ছিল ভটচায্যি মশাইয়ের বাড়ী আর ডালার দোকান। তাঁর ডালার দোকানেই কাজ পেল নিতাই কাকা, আমার বাবাও তখন কাজ করত ওখানে। বাবার মাইনে ছিল আট টাকা আর টাকায় আধপয়সা দস্তুরি।

নিতাই কাকার মাইনে হোলো পাঁচ টাকা, দস্তুরি দুজনেরই সমান রইল। যাত্রী ডেকে এনে দোকানে বসানো ছিল তাদের কাজ। তারপর সেই যাত্রীর কাছ থেকে দোকানদার যা আয় করবে তার উপর দস্তুরির হিসাব হোতো।

ভটচায্যি মশাই লোক খুব সুবিধের নন্—দস্তুরির হিসাবে প্রায়ই গণ্ডগোল করে দিতেন। মাসকাবারে একটাকা পাঁচ-সিকে দস্তুরি হোতো তাতেও আবার গণ্ডগোল। মাস মাইনের কথা আর কি বলব মা ঠাকরুণ! দু'আনা, তিন আনা কিস্তিবন্দি করে মাসের মাইনের

শোধ করতেন ভট্টচায্যি মশাই। মাইনের গণ্ডগোল কোন মাসেই মিটত না।

একদিন বাবা আর কাকা ভট্টচায্যি মশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিলেন। পরের দিন আমাদের বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাবা, আমার বাবাকে কাজে বহাল করলেন। মাইনে ঠিক করলেন দশ টাকা। বাবা যখন এখানে এলো, তখন তার যত পুরনো যজমান সব এখানে চলে এলো।

নিতাই কাকা কোন কাজ না পেয়ে একদিন গেলো বড় হালদার মশাইয়ের বাড়ী। সেখান থেকে দশ টাকা সাহায্য পেয়ে কাকা তখন সাবিত্রী মূর্তি তৈরী করালো। সেই মূর্তি নিয়ে এসে বসত মায়েদের ঘাটে। এই বুদ্ধিটা কে দিয়াছিল জান মাঠাকুরুণ? আমাদের বড় হালদার বাবু। তিনি বলেছিলেন, নিতাই, এটা মায়ের লীলাভূমি। সব ঠাকুরের মূর্তি আছে,—তুই সাবিত্রী মুর্তি নিয়ে বোস। এই পর্যন্ত বলে রতন চুপ করল। চুপ ঠিক নয়, দম নিলো। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুকের ভেতর থেকে। বল্‌ল— সবই মায়ের ইচ্ছে, তিনি না দিলে কি কারুর ক্ষমতা আছে দিতে পারে?

সেইদিন থেকে গঙ্গার ঘাটে মূর্তি নিয়ে বসে এরা। বাপ বসেছে —ছেলে বসছে। মুখখানা একটু ভঙ্গি করে রতন বলল—কোন কিছুই আয় হয় না মা—দীনুদা কি বলে জান! বলে একাজ ছেড়ে দেব; চাক্‌রী করবে দীনুদা—বলে হাসতে লাগল রতন।

সবিতার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, গোপনে তা মুছবার চেষ্টায় মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে বারে বারে।

ওদিকে রাস্তার কাছ বরাবর বড় বট গাছটার তলায় বসে একটা পাগলা গাইছে "আর কত কাঁদাবি মা কালী"—

মাসখানেকের একটা শিশু কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালো একজন ভিখারিণী—হাত পেতে বল্‌ছে সে—দাও মাগো, একটি আধ্‌লা

আমার হাতে তুলে দাও গো জননী। তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। তোমাদের মঙ্গল হবে।

একথা তাদের মুখস্থ বুলি—সবাইকে একই কথা বলে এখানকার ভিখারীরা। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা দিয়ে দেয় এক আধলা পয়সা তাতেই ভিখারীরা খুসী। আধলা পয়সা পেয়ে তারা খুসী মনে চলে যায়—তোমার মঙ্গল হোক বলে।

সবিতা বোধ হয় চমকে উঠেছিল কাঙ্গালিনীকে দেখে। তাড়াতাড়ি দিদিমার গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে তাঁকে কি যেন কি প্রশ্ন করেছিল খুব চুপি চুপি। দিদিমা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

নগদ চারটে পয়সা ভিখারীর হাতে দিয়ে বলছে সবিতা—ওকে দুধ কিনে খেতে দিও; আহা ভাল করে ঢেকে রাখনা বাপু, মাথায় রদ্দুর লাগছে যে—

চলুন মা চলুন। এখানে দাড়িয়ে একজন ভিখারীকে পয়সা দিলে ভিখারীর ঝাঁক ছুটে আসবে—মৌমাছির ঝাঁকের মত। ঐ দেখুন মা-ঠাক্রুণ, যা বলেছি তাই—

শিশু-বৃদ্ধ, জোয়ান-মদ্দ বিচিত্র সাজে বিচিত্র ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে ভিখারীরা। রতন বুদ্ধি খাটিয়ে চতুরতার সঙ্গে পাশের গলির ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিল আমাদের যাত্রী নিবাসে।

॥ ছাব্বিশ ॥

আপন স্থানে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। রতন বুদ্ধি করে আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিল তাই,—তা' না হলে…কে? কে ওখানে, কি চাই?—দরজার কাছে উঁকি-ঝুঁকি মারছে একজন লোক। তাকে দেখেই প্রশ্ন করলাম আমি। একগাল কাল দাঁত বের করে হেসে বল্‌ল লোকটি—আজ্ঞে আপনাকে।

আমাকে? একটু অবাক হলাম আমি। লোকটি প্রশ্ন করছে, ভেতরে আসতে পারি? পরিচ্ছদবিহীন দেহ, কাপড়ের অঞ্চল প্রান্তটা গালার উপর দিয়ে চাদরের মত ঝোলানো কাল কুচ্ কুচে দেহ, মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো, নাদুশ-নুদুশ চেহারা, প্রথম দর্শনে বড় বিশ্রী লাগল লোকটিকে। ঢোক গিলে বললাম এসো।

হাসির জের টেনে বলছে লোকটি, আমি ভদ্র লোকের ছেলে, জাতে ব্রাহ্মণ।

বুঝলাম—আমার 'এসো' কথাটা তাকে ঠিকমত খাতির করতে পারেনি। বললাম, বেসত' আপনার কি বক্তব্য বলুন না।

বলছিলাম—বাবু মশাইয়ের কি দান খয়রাৎ করবার বাসনা আছে?

কেন বলুনত'?

না, মানে ভিখারীর দল যেভাবে আপনাদের পেছু নিয়েছে তাতে মনে হয়…

এতে আপনার লাভ। লাভ আমার নয় আপনার। বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দিলো লোকটি।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা, অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। লোকটি বলছে—যদি আপনি দানধ্যান কিছু করেন তবে আমি আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি।

কি রকম ?

মনে করুন আপনি পাঁচসিকে দান করবেন। নগত পাঁচসিকে গোটা অবস্থায়ত' আর দান করবেন না ; কি বলেন ?

হ্যাঁ তাত ঠিক।

তবে'ই টাকাটা আধ-পয়সায় ভাঙ্গানী করে নিতে হবে। বাজে পোদ্দারের কাছে গেলে আপনাকে তারা ঠকিয়ে টাকায় তিন আধ পয়সা কেটে নেবে—

কেন ? প্রশ্ন করলাম।

ভাঙ্গানীর বাটা নেবে না তারা ! মেহনৎ করে খুচরো পয়সা জোগাড় করে আপনাকে সাহায্য করবে, আপনি তার মজুরী দেবেন না ! দাঁত বার করে হাসল লোকটি। তারপর বল্‌ল—, আমি অবশ্য টাকায় দু'ট আধ-পয়সা নেই মানে গোটা পয়সা। আর আমাকে যদি ব্যবস্থা করতে বলেন—তবে দেখবেন বাবু, একটুও গণ্ডগোল হবে না। প্রত্যেকে সমানভাবে পাবে। কেউ কমও পাবে না ; কেউ বেশীও পাবে না। সব শালাকে লাইন করে বসিয়ে গুণ্‌তি করে তবে দেওয়া সুরু করব। আপনি নিজে হাতেই দান করবেন, আমি পাশে দাড়িয়ে থাকব। শালারা আমাকে যমের মত ভয় করে। তা' না হলে দেখবেন একই লোক বার বার ঘুরে এসে আপনার কাছে হাত পাতবে, আবার কেউ মোটে না পেয়ে পেছনে দাড়িয়ে চীৎকার করবে—। একটু নীরব থেকে মিটি মিটি হেসে বলল লোকটি—এর জন্য টাকায় এক আনা আমি পেয়ে থাকি—পাঁচ সিকিতে পাঁচ পয়সা। আপনি না হয় পুরোপুরি এক আনাই দেবেন।

সেবার শীতকালে বড়বাজারে বিশ্বনাথ গোয়েঙ্কাজীর বাড়ী থেকে এলো দু'শো কম্বল। সে সব আমি বাটোয়ারা করলাম। আমি কি পেলাম জানেন ? একখানা কম্বল আর একটা টাকা। গত সপ্তাহে শোভা-বাজারের রায় বাড়ী থেকে বড় বাবু এসেই আমাকে খোঁজ করলেন। সরকার মশাইকে বল্‌লেন—যাও বাম্‌নাবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে,—বাড়ুয্যেমশাই এসে হুঁসিয়ার করে দিলেন। মন্দিরে যেতে হবে। যিনি আমাদের মন্দিরে নিয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি।

বাম্‌নাবাবুর সাথে চোখোচোখি হয়ে গেল বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের। বল্‌লেন—দ্বেখ্‌ বাম্‌না তোকে কতবার বারণ করেছি এখানে এসে যাত্রীকে বিরক্ত করবি না।

—বিরক্ত করিনি দাদা, কথাগুলো বুঝিয়ে বল্‌লাম বাবুকে। মাইরী বলছি বাঁড়ুয্যে দা, বাবুকে একটুও বিরক্ত করিনি।

বাড়ুয্যেমশাই চলে গেলে বলছে সেই বাম্‌না বাবু—অদ্ভুত এই লোকটি ; অন্য পাণ্ডারা যেমন বখ্‌রা নেয় তেমন বখ্‌রা তুমিও নাও,—নিয়ে, যাত্রীর কাছে আসবার আমাকে সুযোগ দাও। তা' নয়, সৃষ্টি ছাড়া লোক, বলেন, ও আমার সহ্য হবে না।

॥ সাভাশ ॥

পূজোর উপকরণ সাজিয়ে আনলেন পাণ্ডামশাই। পাণ্ডা ভগবতী ভট্টাচায্য, পাতলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মিষ্টভাষী, অমাইক ভদ্রলোক। একটা চ্যাঙ্গারি করে সাজিয়ে এনেছেন পূজোর নৈবেদ্য, কিছু ফলমূল আর কাঁচাগোল্লা। টগর আর নীল অপরাজিতা ফুল মিলিয়ে গাঁথা মালা, সালপাতায় খানিকটা গোলা সিঁদুর।

—জবার মালা চাইযে ভট্‌চায্যি মশাই, মায়ের পূজোয় জবা ফুল বাদ দিয়ে কি ভাল দেখায়?—হাসতে হাসতে বল্‌লেন দিদিমা।

জবার মালা মন্দির-চত্বরেই কিন্‌তে পাওয়া যাবে, সেটা সেখান থেকেই কিনে নেব মা ঠাকরুণ। আমার এখানে জবার মালার অভাব হয়েছে তাই নিতে পারিনি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না জননী। আমায় কিছু বলে দিতে হবে না। আপনার হুকুম যখন হয়েছে, মাকে ষোড়শোপচারে পূজো দিতে হবে, তখন তাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। আপনি মায়ের পূজো সঙ্কল্প করেছেন আমি সেই পূজো মাকে নিবেদন করে দেব, এর মধ্যে কোন গোঁজামিল নেই। বাজারের হাতুড়ে পুরোহিত আমি নই মা যে, কোন রকমে আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম করে নমোঃ কালীকায়ঃ নমোঃ বলে দক্ষিণার পয়সা আদায় করে নেব। গলায় পৈতে দেওয়া ব্রাহ্মণের অভাব নেই মা এ অঞ্চলে। পূজোকরা দূরে থাক, অঞ্জলীর মন্তর পড়াতেই তাদের জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে যায়। যাত্রী পেলেই লুফে নেয় তারা। পূজোর ভোগ হাতে নিয়েই জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে—কার নামে সঙ্কল্প হবে? আপনি বল্‌লেন, শিবনাথ মুখুয্যে—সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করবে "গোত্র"? কেন বাপু? এটুকুও কি জান না? মুখুয্যেরা কোন গোত্রের হয়?

এরাই করেন ভট্‌চায্যিগিরী। ডালির দোকান থেকে মায়ের মন্দির পর্য্যন্ত এদের দৌড়। মোল্লার দৌড় মসৃজিদ্‌ পর্য্যন্ত।

মন্দিরে ঢুকে বির বির করে মন্তর আওড়াবে, ভীড় ঠেলে ঠুলে আপনাকে মাতৃদর্শন করাবে,আপনার কপালে এঁকে দেবে লম্বা সিঁদুরের টিপ, মুখে বলবে—আপনার প্রতি মায়ের অশেষ করুণা,অনেক পরিশ্রম করে দর্শন করিয়েছি আজ, কেমন ভালভাবে দর্শন হয়েছ'ত? তারপর ডান হাতখানা এগিয়ে দেবে আপনার দিকে, "দিন ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে, মা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

বলছেন ভগবতী ভট্‌চায্যি মশাই, তাঁর দেখা শোনা, জানা কথা। প্রশ্ন করলাম—যারা পুজো জানেন, মন্ত্র জানেন, মন্ত্রের ব্যাখ্যা জানেন, সৎ বংশজাত সু-ব্রাহ্মণ সন্তান এমন লোক কি···বাধাদিয়ে বল্‌লেন তিনি,—নেই কে বললে? সব রকম লোক আছে মায়ের স্থানে—ছোট, বড়, মেজো, সেজো, জ্ঞানী-গুনী বহুপ্রকার।

মেজো সেজো ব্রাহ্মণ কারা ভট্‌চায্যি মশাই? আবার প্রশ্ন করলাম আমি।

একটু হাঁস্‌লেন তিনি। বল্‌লেন,—এরা একটু আধটু জ্ঞানী ব্যক্তি। কালী কালী মহাকালী বলে মায়ের অঞ্জলী দেওয়াতে পারে। সর্ব্বমঙ্গল্যে বলে, প্রণাম করাতে পারে। তার উপর গেলেই অসুবিধা।

নিতাই সিমলাই অগ্রদানী পতিত ব্রাহ্মণ। প্রেত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রথম যে দান করা হয়—সেই দান গ্রহণ ক'রে তিনি হয়েছেন সমাজে পতিত। অভাবে পড়ে তিনিও এলেন কালীঘাটে,—যাত্রীদের নৈবেদ্য পুজো করার পেশা নিয়ে। পদবী হলো ভট্‌চায্যি। নিতাই ভট্‌চায্যি বলে পরিচিত হ'ল অনেকের কাছে। যাঁরা তার হাঁড়ির খবর রাখে তারা ব্যঙ্গ করে বলে, 'ঠাকুর'। নিতাই ঠাকুর বলে ডাকে তারা।

সেই নিতাই ঠাকুর এলেন যাত্রীর ডালী নিয়ে মায়ের মন্দিরে। সঙ্গে যাত্রী—বৌবাজারের পরেশ ঘোষ আর তাঁর স্ত্রী। মন্দিরে মায়ের সম্মুখে এসেছেন তাঁরা—পুজারী নিতাই ঠাকুরের সাথে। অঞ্জলী দেবেন

ঘোষ গিন্নী, হাতে ফুল বিল্বপত্র নিয়েছেন বোঝাই করে; বার বার চাইছেন পুরোহিতের মুখের দিকে। নিতাই ঠাকুর মন্ত্র বল্‌লেন। ওম্ কালী কালী মহাকালী কালীকে ··ঘোষ গিন্নী'ত অবাক! ভট্‌চায্যি মশাই বলেন কি? বলুন, বলুন মা; অঞ্জলীর মন্তর বলুন।

আমাদের পূজো, কার নামে সঙ্কল্প করলেন ভট্‌চায্যি মশাই? ঘোষ গিন্নী প্রশ্ন করলেন নিতাই ঠাকুরকে। অঞ্জলী-মন্ত্রে বাধা দিয়ে এরূপ প্রশ্ন করায় নিতাই ঠাকুর ক্ষিপ্ত হলেন মনে মনে।

কেন? পরেশ ঘোষ, কাশ্যপগোত্র। বল্‌বেন রামের নামে পূজো দিতে, দেব কি শ্যামের নামে? কণ্ঠে ক্ষিপ্ততা প্রকাশ পেল নিতাই ঠাকুরের।

ঘোষ গিন্নীত' অবাক! বললেন, মাপ করবেন ভট্‌চায্যি মশাই, আমরা কাশ্যপ গোত্রীয় নয়, বাধা দিয়ে জিভ্-কাটা খেয়ে নিতাই ঠাকুর বল্‌লেন—ও, গৌতম গোত্র? মৃদু হেসে ঘোষ গিন্নী বল্‌লেন—না আমরা ঘোষ, সৌকালীন গোত্রীয়, ঘোষেরা চিরকালই সৌকালীন গোত্রীয়। নিতাই-ঠাকুর ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘোষ গিন্নী বিনয় সুরে বল্‌লেন—এইবার···এইবার আপনি অঞ্জলীর মন্তর বলুন।

—বলুন, ওঁম্ কালী কালী······

ঘোষ গিন্নীর চোখ মুখ এইবার বিরক্তিতে ভরে উঠেছে, দৃঢ় স্বরে বল্‌লেন নিতাই ঠাকুরকে—একে আমি স্ত্রীলোক, তাতে অব্রাহ্মণ কায়স্থ, আমাকে যে ঐ প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করতে নেই, এটুকুও কি জানেন না আপনি? কেমন ধারা ভট্‌চায্যিগিরী করেন!

আচমকা এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না নিতাই, অপ্রস্তুত হয়ে যাত্রীর মুখপানে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভাবছেন এমন যাত্রীর পাল্লায় পড়িনিত' কখনও। তাই অবাক হয়ে চেয়ে আছেন ঘোষ গিন্নীর চোখের দিকে।

ভৈরব ভট্‌চায্যি বাঁচালো সে দিন নিতাইকে। মায়ের মন্দিরে

মা'ই রক্ষা করল তাকে ।···বলুন মা, আমি'ই মন্তর পড়িয়ে দিচ্ছি আপনাকে, বলে, ভৈরব ভট্‌চায্যি মন্ত্র পড়াতে সুরু করলেন—"নমোঃ কালী কালী মহাকালী"······

ঘোষগিন্নী ভক্তিভাবে তৃপ্তিতে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, দক্ষিণান্ত করলেন দু'জনকেই ।

এ সব আমার শোনা কথা নয় মাঠাকরুন—সে দিন ঐ সময় মন্দিরে আমিও উপস্থিত ছিলাম—আমার সঙ্গেও যাত্রী ছিল। এই পর্য্যন্ত বলে, চুপ করবার চেষ্টা করছিলেন ভগবতী ভট্‌চায্যি । পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলাম আমি—ভৈরব ভট্টাচায্য মশাইয়ের মত পুরোহিতের সংখ্যা খুবই কম আছে কালীমন্দিরে, কি বলুন? কম কিসের?—সংখ্যা তুলনায় তাঁরা অনেক বেশী। বললেন, ভগবতী ভট্‌চায্যি । তিনি বল্‌লেন—এঁরাই হচ্ছেন এখানকার মেজো পুরোহিত। আদব কায়দা, নিয়ম পদ্ধতিতে একেবারে পাকাপোক্ত ।

নৈবেদ্য হাতে পেয়ে তাঁরা মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করেন যাত্রীকে—কার নামে সঙ্কল্প হবে? আপনি বল্‌লেন, শিবনাথ মুখুয্যে । অমনি তারা শুনিয়ে দেবে আপনাকে—ভরদ্বাজ গোত্র। অর্থাৎ তাঁরা যে এক একজন পণ্ডিত পুরোহিত; তাঁদের জ্ঞানের পরিধি যে একেবারে সামান্য নয় সেই কথাই বুঝিয়ে দেবে আপনাকে ।

মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাবে আপনাকে। দু'চার পয়সা খরচা করবার সঙ্গতি আছে আপনার, ইচ্ছে করলেই করতে পারেন এ'ভাবটা যদি প্রকাশ পায়, তা'হলে তাদেরই মধ্যে একজন আপনাকে মনোরঞ্জন-সূচক দুটো কথা শোনাবে। অঞ্জলী দেবার পূর্ব্বে আপনাকে আচ্‌মন করাবে—"অপবিত্রঃ পবিত্রোবা—" বলে। তার-পর পরিস্কার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে অঞ্জলীর মন্ত্র পড়াবে। "সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গল্যে-শিবে"—বলে,-প্রণাম করাবে আপনাকে। এদিকে কোন ত্রুটি পাবেন না তাদের ।

যদি কখন এঁদের এক অধ্যায় চণ্ডী পাঠ করতে বলেন বা বিবাহ

পৈতা ইত্যাদি বৃহৎ অনুষ্ঠানে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করতে বলেন, তখন এঁদের হৃদ্‌কম্প সুরু হয়। একশ চার ডিগ্রী জ্বর উঠে যায় দেহে। এদের দৌড় মায়ের মন্দিরকে কেন্দ্র করে, আশে-পাশে সাধারণ যাত্রীদের নিয়ে। এরাই হলেন মেজো পুরোহিত।

কালীঘাটকে কেন্দ্র করে বহু গল্প শুনেছি বহু লোকের কাছে। একটা অধ্যায় আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সেদিন সেই অজ্ঞতা ঘুঁচে গেল আমার। ভগবতী ভট্টাচায্য মশাই ঘুচিয়ে দিলেন আমার সেই অজ্ঞতাকে। গল্প বলতে তাঁর যেমন কোন পরিশ্রম ছিলনা, আমরাও তেমন তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম সেদিনের গল্প।

—তা'হলে, বড়দরের কোন পুরোহিত কালীমন্দিরে আসেন না? কি বলেন?—আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে।

আসে বৈকি। তাঁরা এসে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করেন না কখনও। শিলা-শালগ্রাম নিয়ে তিল-হর্‌তকী-আতপ চাল, ফুল-চন্দন দূর্ব্বা প্রভৃতি সাজিতে করে সাজিয়ে নিয়ে এসে বসেন নাট্‌ মন্দিরে। লক্ষ্মীপুজো, ষষ্ঠীপুজো থেকে সুরু করে—জয়মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, শিব, কালী বহু দেব দেবীর পুজো করেন নাট্‌ মন্দিরে বসে। বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি বহুবিধ যাজ্ঞিক কাজে পারদর্শী তাঁরা। এমন তর বৃহৎ কাজের ফাঁকে এরা এসে বসেন মায়ের নাট্‌ মন্দিরে। এখানে বসে তাঁরা অবসর বিনোদন করেন—গীতা আর চণ্ডী পাঠ করেন। যজমান এলে তাঁদের পুজো করে দেন এক পয়সা দু'পয়সা দক্ষিণার বিনিময়ে। সারাদিন উপবাসী হয়ে বসে থাকেন তাঁরা; বেলা দ্বিপ্রহরে হিসাব করেন দক্ষিণার খুচরা পয়সা কটা—আট আনা দশ আনা। * এরাই হলেন বড়ো দরের পুরোহিত। নাট্‌ মন্দিরে বসে এঁরাই খোঁজ করেন নতুন যজমান। বিবাহ পৈতা ইত্যাদির কাজ জোটে তাঁদের ঐ স্থান থেকেই।

অনেক কথা জানলাম আমাদের পাণ্ডা ভগবতী ভট্টাচায্যি মশাইয়ের

---

* ১৯০৮ সনের কথা।

কাছ থেকে। কথায় কথায় তাঁর অনেক সময় নষ্ট করেছিলাম বটে, কিন্তু পেয়েছিলাম অনেক কিছু।

আর নয় বেলা গড়িয়ে এলো, চলুন পুজো সেরে আসি। বৈকালের দিকে অনেক গল্প শোনাব আপনাকে। ভাল শ্রোতা পেলে গল্প বলতে আমার কোন পরিশ্রম নেই। আছি নিজের মনে, ভাল যজমান এলেই বাঁড়ুয্যে মশাই অনুরোধ করেন আমাকে। তাই মনের আনন্দে পুজোর চ্যাঙ্গারী তুলে নেই হাতে করে। বাপ পিতামহের বৃত্তি গ্রহণ করেছি, এই বৃত্তি নিয়ে বুড়ো হয়ে মরতে চল্লাম মা। তিরিশ বছরের উপর নৈবেদ্যর চ্যাঙ্গারী বইছি আমি। প্রবঞ্চনা জানি না, মায়ের পুজোতে গোঁজামিল দিতে ভয় পাই। যজমানই আমার অন্নদাতা, তাঁদের মঙ্গল চিন্তাই আমার ব্রত। মায়ের ইচ্ছেতেই আছি তাঁর চরণ তলে।

দিদিমা অত্যন্ত খুসী হলেন পাণ্ডামশাইয়ের আলাপ ব্যবহারে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—এখানে থাকেন কোথায়? ছেলে পিলে ক'টি? এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন না করাই উচিত—চোখ-ইসারা করে দিদিমাকে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু চোখোচোখি হয়ে গেল তাঁর সাথে। বল্‌লেন—আপত্তির কি আছে ভাই! মায়ের মন,— সন্তানের কুশল সংবাদ জানার প্রশ্নই আগে জাগে। খুসীর হাসি হেসে বল্‌লেন তিনি, মন্দিরের দক্ষিণ দিকে নেপাল ভট্টাচায্যি মশাইয়ের ভিটে-তেই বাস করি। তিনটি পুত্র দুটি কন্যার পিতা আমি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে দুটি কন্যাকেই ভাল ঘরে ভাল পাত্রে দিয়েছি— বড়ছেলেটি বিয়ে পাশ করে সাহেব কোম্পানীতে চাকরী করে, মেজোটি এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে। আর একটি পাঠশালায় পড়ে।

একখানা তসরের কাপড় পরেছেন দিদিমা। গা'য়ে দিয়েছেন তসরের চাদর, সোনা-বাধানো রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে এগিয়ে চলেছেন মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সবিতাকে ডাকলেন, আয় মা চ; মাকে দর্শন করে আসি।

পরনে লাল ডুরে শাড়ী, হাতে দুগাছি তারের বালা, মাথা বোঝাই চুল ছেড়ে দিয়ে সবিতা দাঁড়িয়েছিল জানলার দিকে মুখ করে। সেখান থেকে পরিস্কার দেখা যায় মায়ের মন্দির। সেই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল মেয়েটি। ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দিদিমার মুখের দিকে —চোখদুটি ছলছলিয়ে ওঠেছে তার। না না, আমি কিছুতেই মায়ের মন্দিরে যেতে পারব না মা, সে অধিকার আমার নেই! বলে, চোখে মুখে কাপড় চাপা দিল সবিতা।

আর কত চোখের জল ফেলবি মা? গঙ্গায় ডুব দিলি, চোখের জল দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্তত' করলি, আর কত? মা কালীকে ডাক, তিনিই তোর মনের কালী ঘোঁচাবেন।···আয়, চল আমার সাথে—সবিতার হাত ধরে টানলেন দিদিমা।

চোখের জল মুছে শান্ত-নম্র সুরে মাথা নীচু করে বল্‌ল সবিতা—আমাকে এ' অবস্থায় দেব-মন্দিরে যেতে নেই, তা কি জান না দিদিমা?

মুখ টিপে হাসলেন দিদিমা—ও, তাই বল! তবে তুই থাক এখানে,—আমিই তোর নামে পুজো দেব'খন।

আসুন দাদুভাই—ডাকলেন, ভট্‌চার্য্যি মশাই। আমি আর দিদিমা চল্‌লাম তার সাথে কালীঘাটেশ্বরী কালী দেখতে; তাঁর চরণে পুজো নিবেদন করতে।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসো দিদিমা, বেশী দেরী করো না যেন। কানের কাছে মুখ এগিয়ে চুপি চুপি বলল সবিতা। তারপর জানলার

কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের চলার পথের দিকে ঠায় চেয়ে রইল মেয়েটি।

পথে নেমে ভাবছি সবিতার কথা। কত চেষ্টা করলাম তাকে মনথেকে সরিয়ে দিতে। যাঁকে দর্শন করতে চলেছি তাকেই চিন্তা করলাম মনে মনে। মন ছুটে ছুটে আসে সবিতার কাছে। তার ব্যথাভরা মুখখানি ভেসে উঠে চোখের সামনে। পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি! যা কিছু অন্যায় তাইত' পাপ, আর যা কিছু ন্যায় তাইত' পুণ্য; অন্তর্দাহই তার প্রায়শ্চিত্ত। সবিতা কি অন্যায় করেছে! কার ভুল, কে অন্যায় করেছে! এই প্রশ্নই করেছি মনে মনে। কিন্তু ঠিক উত্তর মেলাতে পারিনি।

মন থেকে সব কিছু জোর করে সরিয়ে দিয়ে এলাম মায়ের মন্দির চত্বরে। যে চোখের ভিতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে তারইত' স্থায়ী বাস হয়—হৃদয়রাজত্বে। মায়ের সদর গেট নহবৎখানার ভেতর দিয়ে এলাম মায়ের বাড়ীতে।

সব ভুলে গেলাম,—মায়ের বাড়ী এসে। মুহূর্ত মধ্যে অতীত আমার পর হয়ে গেল। পরম একান্ত আত্মীয় হোলো বর্ত্তমান। মায়ের কথা, মায়ের মহিমা ভরে রইল সারা অন্তর জুড়ে। এ-যে একটা মানসিক অনুভূতি, চিত্তবিকার সুরু হয় তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করলে। যত পাপ, যত ক্লেদ ধুয়ে মুছে যায় ভক্তের দেহ হতে।

নহবতের নীচু দিয়ে মন্দিরের দিকে দু'পা অগ্রসর হলেই প্রথমে নজর পড়ে শ্যামরায়ের মন্দির। শ্যামসুন্দর আর রাধিকার যুগলমূর্তি আছে কাঠের সিংহাসনের উপর। অপরূপ মূর্তি, মনে হয় যেন সদ্য তৈরী করে এনে বসানো হয়েছে। মাথা নত করে ভক্তি-ভরে প্রণাম করালাম তাঁকে—দিদিমাও হাতে লাঠিটা নামিয়ে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম জানাচ্ছেন শ্যামসুন্দরের মন্দির-সিঁড়িতে। পাণ্ডাঠাকুর বললেন—

আমরা পরে পুজো দেব এখানে। মায়ের বাড়ী এসে, আগে মায়ের পুজো দেওয়াই বিধান।

আমি বোধ হয় তখনও হাতজোড় করে চোখ বুজে প্রণাম করছিলাম, দিদিমা ছোট্ট একটি ধাক্কা দিলেন আমাকে। কি ভাই, কি বর প্রার্থনা করছ মনে মনে? মিটি মিটি হাসতে লাগলেন তিনি।

সিঙ্গা বেজে উঠলো গুরুগম্ভীর আওয়াজে, সুরু হলো নহবৎখানায় সানাইয়ের সুর। লাল সালুর পাগ্‌ড়ী বাঁধা মাথাগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠলো ভীড়ের মাঝে পথ তৈরী করে দিতে। ভীড়ের চাপ এগিয়ে আসতেই আমরা সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালাম শ্যামসুন্দরের মন্দির চত্বরে। দিদিমাকে হাত ধরে টেনে তুলে নিলেন পাণ্ডা মশাই।

—ব্যাপার কি?

গুরুদেব এসেছেন মায়ের মন্দিরে। হালদার বংশের গুরু, নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। দেখুন দেখুন মা, চেয়ে দেখুন, ঐযে আসছেন তিনি।

আহা মরি মরি,—অজান্তে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো দিদিমার কণ্ঠ হতে। যেমন অদ্ভুত সুন্দর চেহারা, তেমন অপরূপ দেহ-কান্তি। চাঁপাফুলকেও হার মানিয়ে দেয় তাঁর গা'য়ের রঙ। চেলীর কাপড় পরনে। গলায় উত্তরীয়। সাদা পশমের মত চুলে মাথা বোঝাই, সে মাথায় ধরা হয়েছে রূপোর ছাতা, পায়ের খড়ম রূপো দিয়ে বাঁধানো।

মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন তিনি, সম্মুখে দু'জন পাইক চলেছে রূপো-বাঁধানো দণ্ড হাতে নিয়ে। ভক্তিভরে হাতজোড় করে তাঁকে প্রণাম করলেন দিদিমা। আমিও প্রণাম করলাম তাঁর সাথে সাথে।

দেখে ভক্তি হোলো। ভক্তি,—ও ত একটা আকর্ষণ, অসাধারণ শক্তি বলে যিনি বলীয়ান, তিনি'ই পারেন সাধারণ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে! জীবের অন্তরে অনুরাগ এনে দিতে পারেন তিনি।

শুধু আমার কেন, অনেকের ভক্তি-উদ্রেক করেছিলেন তিনি। অনেকেই যুক্ত করে প্রণাম করলেন তাঁকে, ভিড় ফাঁকা করে যাবার

যাঁর সুবিধে হোলো, তিনি মাথা নত করে প্রণাম করলেন তাঁর যুগল চরণে।

গুরুদেব,—সংসার-তরীর কাণ্ডারী তিনি। ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে তিনি রক্ষা করেন আপন তরীর যাত্রীকে। বহুশক্তির আধার তিনি। শক্তিধর গুরুদেব এসেছিলেন শিষ্যের কাছে, আসা-যাওয়ার পথে জগজ্জননীর সাথে সাক্ষাৎ করে যান গুরুদেব।

দিদিমাকে বুঝিয়ে বলছেন ভট্‌চায্যি মশাই,—ভিড়টা একটু হাল্‌কা না হলে মন্দিরে যাওয়া আপনার পক্ষে একটু কষ্ট হবে মা ঠাকরুণ, একটু বসুন এখানে। দিদিমা বসলেন শ্যামসুন্দরের মন্দির-চত্বরে। আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম হালদার-গুরু-দর্শন-প্রার্থীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

পাণ্ডা মশাই বলতে লাগলেন, সকল কাজেই গুরুকে স্মরণ করেন হালদার মশাইরা। মায়ের পদাঙ্গুলী স্নান করানো হবে,—স্মরণ কর গুরুদেবকে। দুর্গোৎসব হবে,—এসে দাড়াবেন গুরুদেব। কোন শুভ অনুষ্ঠান হবে হালদার বাড়ী,—সেখানেও উপস্থিত থাকবেন গুরুদেব; তিনি অপারগ হলে, গুরুবংশের অন্য কেউ।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সেদিন—মাকে ভোগ নিবেদন করলেন হালদার মশাইরা—চিঁড়ে-দৈ, আম-কাঁঠাল, দুধ, ক্ষির-ছানা ইত্যাদি দিয়ে মাকে 'আম' নিবেদন করলেন তাঁরা। কোন নতুন দ্রব্য নিজেদের ভোগে লাগাবার আগে মাকে নিবেদন করেন তাঁর সেবাইতরা। প্রসাদের অগ্রভাগ তুলে দেন গুরুর হাতে। মায়ের মন্দির-সেবাইতদের এই রীতি চলে আসছে আবহমান কাল থেকে।

সেদিন সেই অনুষ্ঠানের সব কিছু দাঁড়িয়ে দেখলেন গুরুদেব। বংশের অনেকেই আম্রফল দান করলেন গুরুকে। সে-সব অনুষ্ঠান-পর্ব সেরে গুরু ফিরছেন নিজ ভবনে। এমন সব অনুষ্ঠানে গুরুদেব আসেন সম্মানিত ছাতা মাথায় দিয়ে।

পাণ্ডা ভগবতী ভট্টাচায্যের মুখে এসব বর্ণনা আর কাহিনী শুনে মনটা ভরে গেল।

ভাল দিনে এসেছেন মা জননী, এঁদের গুরুর সাথেও সাক্ষাৎ হয়ে গেল। অনেক কথা কইতে পারেন ভট্টচায্যি মশাই। অনেক গল্প শোনালেন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আড়াই'শ পৌনে তিন'শ বছর পূর্বে এক যোগী-পুরুষ এসেছিলেন কালীঘাটে। মায়ের ঘাটের দক্ষিণ দিকটায় বসেছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবীমূর্তি সিংহ-বাহিনী।

কে ইনি?—কোথা হ'তে এলেন? কি ভাবে এলেন? অনেক প্রশ্নই করেছিলেন সেদিনের লোকেরা। সে-প্রশ্নের উত্তর পায়নি কেউ।

প্রায়-উলঙ্গ জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী। এ'ত সে সন্ন্যাসী নয়!—যাঁরা ঘাটের পাড়ে বসে আছেন রুজী-রোজগারের আশায়, রাত্রে যাঁরা ধূনি জ্বালিয়ে মাভৈঃ চীৎকার করেন—ইনি'ত সে সন্ন্যাসী নন।

তবে কে ইনি? ঠায় বসে আছেন একই স্থানে একই ভাবে। খবরটা পৌঁছলো সে-দিনের মায়ের সেবাইত রামকৃষ্ণর কানে। ভবানীদাসের পৌত্র তিনি। পিতামহর মত তাঁর দেব-দ্বিজে অগাধ ভক্তি। তিনি এলেন মায়ের ঘাটে—সন্ন্যাসী দর্শন করতে। দেখলেন, তাঁর সারা অঙ্গে বিভূতি মাখা, নির্বাক, নির্লিপ্তভাব সন্ন্যাসীর।—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, সেইরূপ, সেই ভাব। তাঁর স্বপ্নে দেখা মানুষটির সাথে মিলে গেল সন্ন্যাসীর সব কিছু। স্বপ্নের ঘোরে সন্ন্যাসী বলেছিলেন তাঁকে—সংকটের দিনে গুরু ধরিস্ বেটা, সেই তোর সংকট কাটিয়ে দেবে।

কে আমার গুরু হবে প্রভু?

একদিন সে'ই তোর কাছে আসবে, তখন দেখিস্ তাকে।

রামকৃষ্ণ ভাবছেন,—আজ পেয়েছি সেই লোক মহা সংকটের দিনে তিনি এসেছেন আমার কাছে।

প্রণাম করলেন রামকৃষ্ণ। হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন সন্ন্যাসী। সিংহবাহিনীর পুজো পাঠালেন রামকৃষ্ণ, সন্ন্যাসী পুজো করলেন আরাধ্যা

দেবতাকে। তারপর তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন তিনি। কথা কইলেন রামকৃষ্ণের সাথে। শোনালেন কয়েকপুরুষের অতীত ইতিহাস। যেন ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী।

আদেশ করলেন রামকৃষ্ণকে—"কাল প্রত্যুষে তোকে দীক্ষা দেব, সব কিছু প্রস্তুত রাখিস্।"

যেন পূর্ব্বে সকল কথাবার্ত্তা হয়েছিল,—সেদিন শুধু কাজের কথা হোলো।

সকলে'ত অবাক !

গুরুর জন্যে মন্দির বানিয়ে দেবো, গুরুকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করব—রামকৃষ্ণ ভাবছেন মনে মনে। অন্তরের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন তিনি মুখটি বন্ধ ক'রে।—"তুই দেবার কে রে বেটা?" সন্ন্যাসী উত্তর করলেন। ভক্তের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্লো। যেন একখণ্ড তপ্ত লোহা ঠেসে ধরল তাঁর বুকে।

আবার প্রণাম করলেন ভক্ত। বহুক্ষণ ধরে মাথা নত করে রইলেন তিনি। গুরুপদে সঁপে দিলেন অন্তর-বাহির। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করলেন তাকে,—"তোর সকল সংকট কেটে যাবে।"

গুরুর বাক্য সফল হলো সেই বছরেই। বর্গীরা এসেছিল লুঠ আর অত্যাচার করতে। কালীঘাটে এসেছিল তারা। কালীমন্দিরে এসেও তারা ফিরে গিয়েছিল গুরুর কৃপায়, রামকৃষ্ণকে রেহাই দিয়েছিল মারাঠা সর্দার।

এসব কাহিনী শুনে—যত অবাক হয়েছি, তার থেকে অনেক বেশী অবাক হয়েছি পাণ্ডা ভগবতী ভট্টাচায্যি মশাইকে দেখে। কত কথা জানতেন তিনি; কত কথা বলতেন মধুমাখা করে। ভারী ভাল লাগত তাঁর কথাগুলো শুন্তে, এই না হলে পাণ্ডা! তারপর? দিদিমা আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করলেন ভট্টচায্যি মশাইকে—

তিনি বল্‌লেন—

গুরুদেব লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মচারী দক্ষিণা পেলেন শিষ্য রামকৃষ্ণের কাছ থেকে—ছু'শো আড়াই-শো বিঘে জমি আরো অন্যান্য বহু সামগ্রী। ব্রহ্মচারী গুরু,—গৃহী হলেন শিষ্যের অনুরোধে। সংসার ধর্ম্ম করলেন কিছুকাল। তারপর একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। আচম্বিতে যেমন এসেছিলেন তিনি, তেমন চলে গেলেন আচম্বিতে।

সেই লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মচারীর প্রোপৌত্র নেপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য,—ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্যের পিতা।

ছু'শো আড়াই-শো বিঘের উপর জমি দান পেয়ে কি করলেন তাঁরা? আমি প্রশ্ন করেছিলাম সেদিন।

দাদাভাই, এইবার আপনি আমায় হাঁসালেন। জমি থাকে যার তিনি'ই' ত জমিদার। জমিদারের কাজ তাঁরা করলেন ধীরে ধীরে। প্রজা বসালেন, খাজনার টাকা হিসাব করলেন কড়া-ক্রান্তি করে।

কেন? বিঘে কয়েক জমি, দশ বিশ ঘর জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দান করলেই পারতেন! তাঁর দানে পাওয়া জমির উপযুক্ত মর্য্যাদা হোতো তাতে। কালীঘাট হয়ে উঠত' জ্ঞানী-গুণীর গৌরব স্থল। তাঁরাই দাতার জয়গান করতেন। স্মরণীয় হয়ে থাকতেন তিনি তাঁদের কাছে; আদর্শ থাকত ভবিষ্যতের জন্যে।

আমার কথায় বাধা দিলেন পাণ্ডা মশাই। বললেন, দান তাঁর অনেক আছে। বহু অতিথি সেবা করতেন তিনি। তাঁর ব্রতই ছিল অতিথি সেবা করা। গঙ্গার ধারে অতিথিরা চাল, ডাল, তেল, নুন নিয়ে এসে নিজেদের সেবায় বসতেন যেস্থানে, সেইস্থানেই ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন নেপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, রাস্তা গড়েছেন নিজের নামে—'নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট'...

চলুন মা, ভীড় হাল্‌কা হয়ে গেছে, বেলাও দশটা বাজল, পুজোটা সেরে আসি। আসুন দাদাভাই, মায়ের হাতটা ধরুন ঠিক করে।

বুঝলাম আলোচনা আর বাড়াতে চান না ভট্টচায্যি মশাই, তাই, তিনি সব তাল-লয় কেটে দিলেন সুরের মাঝ পথে।

এগিয়ে চলেছি মায়ের মন্দিরের দিকে। দিদিমা সিঁড়ি বেয়ে নামছেন ধীরে ধীরে।

আমার সারা মন জুড়ে বসে রইলেন সেই অলৌলিক-পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মচারী। অন্তরের শ্রদ্ধা মনে মনে নিবেদন করলাম তাঁকে। আজকের গুরুকে দর্শন না করলে সেদিনে সেই গুরুকে জানা'ই হোতো না। তাঁকে স্মরণ রাখ্‌বার কোন চিহ্নই নেই কালী মন্দিরের আশে পাশে। বহু ঘুরে দেখেছি কোথাও তাঁর চিহ্ন খুঁজে পাইনি।

॥ ঊনত্রিংশ ॥

অভ্যাস বশতঃ কাহিনী শুনছিলেন বউমা, হঠাৎ উঠে গেলেন। বল্‌লেন—এসেছে সে পাগলীটা। এতদিন পরে এইবার রীতিমত পাগল হোলো মেয়েটি। নিয়মিতভাবে আসতে সুরু করেছে এখানে।

আসার সময় সুগন্ধী ফুল নিয়ে আসে কোঁচরে করে। বাটীভরে আনে শ্বেত-চন্দন,—সিঁড়ি বেয়ে সোজা চলে যায় ব্রজগোপালের ঘরে। ব্রজকে সরিয়ে রাখেন বউমা—আঁচল চাপা দিয়ে। তাতে কিছু আসে যায় না মেয়েটির। সে'ত ব্রজগোপালের রক্তমাংসে ঢাকা অস্থিমজ্জার দেহটা চায়নি কখনও। চোখ দুটি তার ব্যাকুল হয়েছে ব্রজদর্শন আকাঙ্ক্ষায়। বউমা কত দিন বলেছেন তাকে,—ডেকে দেব ব্রজকে, তোমার চোখের সামনে ভাল করে দেখবে তাকে? কেঁদে আকুল হয়েছে বেচারা।—না মা, সূর্য্যের কাছে গেলে আমার চোখ দুটো ঝল্‌সে যাবে, সে আমি সহ্য করতে পারব না কিছুতেই।

আজকাল মেয়েটি সে সব কথা আর বলে না। সোজা চলে আসে ব্রজর ঘরে। তার ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে দেয় ফুল-চন্দন, কাঁচাগোল্লা এনে ভোগ দেয় তাকে। আপন মনে মধুরস্বরে গান গায়। কাঁদে,—বলে, "হুকুম কর ঠাকুর—আদেশ কর আমায়, কোন গানটা গাইতে হবে—বলো। আবেগভরে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় পথে। কোনো আদেশ, কোনো আজ্ঞা মানতে চায় না পাগলিনী।

কেঁদে কেটে রোজ একই কামনা করে সে—

কোথায় তুমি ব্রজেশ্বর, ব্রজগোপাল,
ক্ষণেকের তরে দয়া কর মোরে।
আমি কন্যা চম্পাবতী—
নাহি কোনো অন্যগতি,
জীবন সঁপেছি যে তোমারে;
দয়া কর, কৃপা কর, দেখা দাও মোরে॥

এই তার গান, এই তার কথা। গাইতে গাইতে আসছে চাঁপা ব্রজর সন্ধানে। এতটুকু বয়সে এত ভালবাসা সে কোথায় পেল? ভাব; ভাবের থেকেই ভালবাসা। ভাবের সাগরে ডুব দিয়েছে কিশোরী! হাবু-ডুবু খেয়েছে সেখানে। অবলম্বন করেছিল ব্রজকে—ভেবেছিল, ওই বুঝি ওকে কূল পায়িয়ে দেবে। তাই'ত মাঝে মাঝে গায় পাগলিনী—আমার এ কূল ও কূল

দু' কূল গেল।

বউমায়ের বড় ভয়—ব্রজকে বুঝি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে চাঁপা। কত কাণ্ড করে, কত আরাধনা করে,—বারমুখী ব্রজগোপালকে ঘরমুখী করেছেন বউমা। সংগীত-প্রিয় ছেলেকে ঘরে বেঁধেছেন সংগীতের লোভ দেখিয়ে। বাইরের থেকে তাকে এনেছেন ঘরে।

কিন্তু চাঁপা? ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে ব্রজর সন্ধানে। সে যে ব্রজকে ভালবেসেছে, আত্মার চরণে নিবেদন করেছে তার আত্মাকে। বাইরের সব খোলোস ছেড়ে দিয়েছে সে,—রং-চং পোষাক পরিচ্ছদ দেহের অলংকার সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছে ব্রজেশ্বরের শ্রীচরণে।

পঙ্কে ডুবে ছিল মেয়েটি,—রূপের ফাঁদ পেতেছিল সে। রূপ আর রূপোই ছিল তার একমাত্র প্রিয়। একান্ত প্রিয় ছিল ভোগের লালসা।

সব কিছুই গেছে তার। প্রায় বিবস্ত্র হয়ে গেছে চাঁপা। বউমাইত' তাকে জোর করে নতুন কাপড় পরিয়েছেন। তিনি ক্ষমা করেছেন ব্রজগোপালকে আর রূপাজীবা প্রণয়িনীকে। মা-যে ক্ষেমঙ্করী। চাঁপাকে জানিয়েছেন তিনি সহানুভূতি, তাকে দিয়েছেন শুদ্ধা-বাৎসল্য-ভাব—মা-যে সর্বংসহা স্নেহময়ী।

এই স্নেহময়ীর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে, চাঁপা কেঁদে-কেটে বলেছে—"বল না মা যশোদাময়ী, আমার কি মুক্তি হবে? গোপাল-চরণ স্পর্শ করা ঘটবে কি আমার কপালে?"

বউমা বলেছেন,—ঘটবে বৈকি! যে এমন করে সঁপে দিতে

পারে নিজেকে—তার মুক্তি হবে না, তার দেবদর্শন ঘটবে নাত' ঘটবে কার !

আঃ—আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল উন্মাদিনী ! পরম তৃপ্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে চাঁপা ।

এ ঘটনার পর বহুদিন তার কোন সন্ধান পাইনি । বউমাকে কিম্বা ব্রজকে জিজ্ঞাসা করতেও দুঃখ বোধ করেছি ।

বউমায়ের ভাই সতীসাথ এসেছিল সেদিন,—সেই বলে গেল উন্মাদিনীর কথা । বল্‌লে—কালীঘাট ছাড়া করে দিয়েছি তাকে । আর কোনদিন আসবে না এখানে । ধরে-বেঁধে পাথুরে ঘাটায় পৌছে দিয়েছি সেই কুলটা মেয়েকে !

কথাটা বউমায়ের কানে পৌছতেই চমকে উঠেছিলেন । ভেবেছিলেন নিজের কান দুটো দুহাতে চেপে ধরবেন কিন্তু পারেন নি, উত্তর দিলেন তার ভাইয়ের কথায় । বল্‌লেন হঠাৎ তোমার পরোপকার প্রবৃত্তিটা যে জেগে উঠলো দাদা ?

জানিস্‌ না সর্বানি,—ওরা মায়াবিনী, সব কিছু করতে পারে ওরা । ব্রজকে নষ্ট করবার জন্য ও কি কম চেষ্টা করেছে ! আমি খুব ভাল করে জানি ওকে । মাঝে মাঝে দু'চার টাকা প্রণামী-ট্রণামী দিত আমাকে,—সেই লজ্জায় কিছু বলতে পারতাম না ।

আজকাল তা পাওনা বলেই বুঝি তাকে সরিয়ে দিলে দাদা ?—আর কোন কথা কইতে পারলেন না বউমা । তাড়াতাড়ি সরে গেলেন সতীনাথের কাছ থেকে । ব্রজর ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন ।

॥ ত্রিংশ ॥

মন্দিরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি মাকে। মায়ের একান্ত নিকটে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে দেখছি—তাঁর জাগ্রত মূর্তি। ত্রি-নয়নি মা জগদম্বা দেখ্‌ছেন তার অগণিত সন্তানের দিকে চেয়ে। কান পেতে শুন্‌ছেন বহু আবেদন-নিবেদন। চতুর্ভূজা-জননী একহাতে সন্তানের পুজো গ্রহণ করেন, আর একহাতে আশীর্ব্বাদ করেন সকলেরে। একহাতে অসুর-মুণ্ড আর এক হাতে খড়্গ !

নানাপ্রকার উপচার নিয়ে আস্‌ছে ভক্তের দল—ডাকছে চীৎকার করে, 'মা মা' বলে। ছানা, দুধ, দই, ঘোল, মিঠাই-মণ্ডা, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ যার যা বাসনা নিয়ে আস্‌ছে মায়ের কাছে। চিন্তা-মণিকে চিনির সামগ্রী নিবেদন করে ভক্তেরা ; চিন্তাহরণ কর মা, বলে, প্রণাম করে তারা। কত চিন্তা তাদের। স্বামী-পুত্রের চিন্তা, আত্মজনের চিন্তা, দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের চিন্তা, রোগ-শোকের চিন্তা, সব চিন্তাই যে হরণ করেন মা-চিন্তামণি।

ডাকার মত ডাকতে পারলেই তিনি শুন্‌তে পান—

'অহম্‌' ভাব নিয়ে আসে মায়ের ধনী ছেলে, বলে, আমি এলাম। মাকে কিছু দিতে এলাম। নামটা লিখিয়ে দাও খাজাঞ্চীর খাতায়।

দারিদ্রহারিণী মা কি এতই দরিদ্র ? যিনি অন্নদায়িনী, বুভূক্ষুপালিনী —তিনি কি এসব চান ? তিনি চান শুদ্ধ ভক্তি, ভক্তি দিয়ে ভালবাসুক তাঁকে। দিনান্তে সন্তানেরা একটিবার স্মরণ করুক তাদের মাকে। যে সন্তান মাকে ভালবাসে না, সে দুনিয়ার আর কাকে ভালবাসতে পারে ?

ভিড়ের মাঝে আমি স্থানচ্যুত হয়েছি। ঠেলা খেতে খেতে সরে

গেছি বহুদূর। দিদিমা মন্দিরের কোণ ঘেসে বসে কালী-নাম জপছেন। পাণ্ডামশাই ভিড়ের চাপ ঠেলে রেখেছেন, তাঁকে আড়াল করে।

ভিড়, অসম্ভব ভিড়। তিথি নক্ষত্র দেখে ভিড় কমে বাড়ে! শনি মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথি হলেই ভক্তের-আনাগোনা বৃদ্ধি পায় সেদিন অতিমাত্রায়। তাছাড়া অন্যান্য পর্ব-ত আছেই। মহাষ্টমী, বিজয়া-দশমী, পহেলা-বৈশাখ, স্নানযাত্রা-তিথি, রামনবমী, পৌষমাস, জ্যৈষ্ঠ-মাস মায়ের বাড়ী ভিড় সব সময় লেগেই আছে।

দাস্থর মা ছুটে এসেছে নালিশ জানাতে। কেঁদে কেঁদে বলছে, তুমি না দেখলে আমার দেখ্‌বার কে আছে মা? তুমিত' দেখলে মা, আমার দাস্থর কী দোষ? তাকে মিছেমিছি কেন চোর বলে ধরিয়ে দিল বাবুরা!—আমি দিব্যি কেটে বলছি মা, আমার দাস্থ চুরি করেনি। চুরি করেছে দিদিমণির পিরিতের বাবু। আমি নিজের চোখে দেখেছি, দিদি-মনি-ই সে চুরির সাহায্য করেছে। আবার নিজেই চোর চোর করে চীৎকার করছে বাড়ীময়। মেরে মেরে আমার বাছাকে তারা আধমরা করে পুলিশে দিলে, তুমিই তাকে রক্ষা কর মা।

—কে? কে অমন করে চেঁচায় ওখানে? চুপ কর, চীৎকার কোরো না,—হুকুম হোলো সেবাইতের তরফ থেকে।

"না বলবে না"—মুখ ভেঙ্গিয়ে উঠলো দাস্থর মা। বলল,—আমার কে আছে যে, আমার হয়ে দু'টো কথা কইবে! মাকে বলব না-ত বলব কাকে? আমি যদি মিথ্যে বলি মা,—জিভ্‌ যেন আমার খসে যায়, চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে যায় আমার।

মা যে অন্তর্যামী। দেখেন সব, বোঝেনও সব। সময় মত প্রতিকারও করেন। তাঁর কাছে ছোট বড় ভেদ নেই।—ব'কে চলেছে দাস্থর মা, কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে বেচারা।—

"সরিয়ে দে,—সরিয়ে দে'ত ঐ পাগ্‌লীটাকে। মেজাজী গলায়

চেঁচিয়ে উঠলেন সেবাইত মশাইয়ের প্রতিনিধি। মায়ের সম্মুখে বড় দরজার চত্বরে ক্যাসবাক্সের পাশে বসে আছেন তিনি।

কি বললে ? আমি পাগলী ? সত্যি কথা বললেই তোমরা তাকে পাগল বলে হটিয়ে দাও। আমার মায়ের কাছে এসে আমি সত্যি কথা বলব না ?

আবার বললেন, সেবাইতের লোক, পূজো দিয়েছিস্ মাকে ? মা তোর কথা শুনবেন কেন ? সেই থেকে বক্ বক্ করছিস এখানে। পালা এখান থেকে,—ধরম্‌সিং, ধরমসিং পাগলীটাকে বার করে দাও।

বিচার যেন তাদের হাতে। যেমন মক্কেল—তেমন বিচার। শোভা-বাজারে রায়মশাই এসেছেন,—নিত্যানন্দ রায়। সেবাইতের কাছে তাঁর খাতির যত্ন এক রকম। আবার খিদিরপুরের লছ্‌মন ছুবে এসেছে ছেলে-বউ, নাতি-নাত্‌নী নিয়ে কালীমাকে দর্শন করতে, তার খাতির যত্ন আর একরকম। রায়মশাই জাহাজের মালিক, আর লছ্‌মন জাহাজের কুলী। প্রার্থনা কিন্তু ছু'জনেরই এক।

উৎসুক হয়ে চেয়ে রয়েছেন সেদিনের পালাদার। যার যেদিন পালা পড়ে, তার ভাগ্য নিয়ে সেদিন চলে জুয়াখেলা। সেদিনের যজমান মাকে যা কিছু দেবে, যা কিছু নিবেদন করবে মায়ের উদ্দেশে সবই পালাদারের প্রাপ্য। বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মায়ের সেবার পালা ভাগ হয়েছে ভুবনেশ্বর গিরির একমাত্র জামাই ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর বংশধরদের মাঝে। নাতি-নাত্‌নী দৌহিত্র-পৌত্র, সন্তানদের সেবার পালা ঘুরে আসে বছর বছর। যে যেমন লোক তার পালার অংশও তেমন।

রায়বাবুর হাতে আছে হীরের আংঠি, গলায় হীরের বোতাম, কাল ইঞ্চি-পেড়ে দেশী-ধুতি পরনে,—পাঁচখানা জাহাজের মালিক।

পালাদারের মুখে হাঁসি ফুটে বেরিয়েছে, মা আমার অন্তর্যামী। বড় টানাটানি যাচ্ছিল ক'টা মাস। মেয়েটার বিয়ের গয়নাগুলো

জোগাড় হয়নি আজও। বছরে মাত্র পাঁচটি পালা। কি আর পাই বল? দুঃখ করে বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে।

মা যার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাকে দেন দু'হাত ভরে। একবার নেপালের কুমার বাহাদুর এসেছিলেন মাকে দর্শন করতে। সেদিনের পালা ছিল প্রিয়নাথের। কুমার বাহাদুর প্রথমেই মাকে প্রণামী দিলেন পাঁচশত এক টাকা। মায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন গিনির মালা। নাকে সোনার নথ আর নাকছাবি, শীতের জন্য অদ্ভুত কারুকার্য্য করা কাশ্মিরী শাল, বেনারসী শাড়ী এমন ধারা অনেক জিনিস। মা যা পেলেন, তার সব কিছুর উত্তরাধিকারী সেদিনের পালাদার। প্রিয়নাথ সব কিছু পেল সেদিন, পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিল।

আজকের পালাদারেরও সেই চিন্তা। কোথায় টাকা কোথায় মেয়ের বিয়ে। টাকাওয়ালা যাত্রী এলেই না বেশী টাকা প্রণামী পড়ে মায়ের চরণে।

পাঁচখানা জাহাজের মালিক রায়বাবুকে দেখে মনটা নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছে পালাদারের।

মায়ের হাতের খড়্গ থেকে সিঁদুর নিয়ে রায়বাবুর কপালে লম্বা টিপ এঁকে দিলেন সেবাইত মশাই। চেঁচিয়ে বললেন—"জয়মা জগদম্বা, রায়বাবুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা"—

যেন উকিল বাবু মক্কেলের হয়ে হাকিমের কাছে আবেদন করলেন।

ওদিকে লছমন দুবে বিনা উকিলেই কাজ সেরে নিচ্ছে নিজে নিজেই। ছেলে, বউ, নাতি, নাত্নীকে টিপ্ টিপ্ করে প্রণাম করাচ্ছে মায়ের চরণ তলে।

রায়বাবু পালাদারের হাতে গুঁজে দিলেন দশটা টাকা প্রণামী বাবদ। আট আনা করে দিলেন বেশকারী মিশ্র-মশাইদের হাতে। ব্যস, এই পর্য্যন্ত,—মনটা বড় দমে গেল পালাদারের।

ডাকছে লছমন দুবে—"পাণ্ডাবাবু টিকা লাগাও"—তার পর হাঁসি-

হাঁসিমুখ করে প্রশ্ন করে মিশ্রমশাইকে—"আজকের-পাণ্ডা কৌন হ্যায় ? কার পালা ?"

—"কেন রে বাপু এত খবর কেন ? প্রণামী-ট্রণামী দিবি নাকি দু'চার টাকা ?"

—"দিবো বই-কি বাবুজী"। একগাল হেসে বল্‌ল, লছ্‌মন দুবে। যাঁর কৃপায় জাহাজের কুলী-সর্দার আজ জাহাজের মালিক হ-ইয়ে-ছে, তাঁকে ভেট্ চড়াই'ব না ? বো-লেন কি পাণ্ডাবাবু ! ওয়াটসন্ সাহাব হামাকে বহুৎ পেয়ার ক'রে ; ব'লে, লছমন তুই হামার বেটা। তোর নামে একখানা জাহাজ উইল করিয়ে দিয়েছি। সবকিছু কালী-মাইজীর কৃপা—পাণ্ডাবাবু। মাইজী বহুৎ দয়া করিয়েছে হামাকে।

পালাদারের বিষণ্ন মুখ প্রসন্ন হচ্ছে ধীরে ধীরে। জামার নীচে ফতুয়ার পকেট থেকে টাকা বার করে গুনৃতে গুনৃতে বলছে লছমন—একশত একটাকা পাণ্ডাবাবুর দক্ষিনা—পাঁচশত একটাকা মাইজীর পূজা, দুইশত একাওন টাকা কাঙ্গালী লোগ্‌দিগের ভোজন বাবদ ; ঔর বাকী টাকা খরচা করিয়ে মাইজীর একখানা বেনারসী কাপড় খরিদ করিয়ে দিবেন—মোট এক হাজার পাঁচ টাকা আপনার হাতে ধরিয়ে দিলাম। সোব-ই কালী মাইজীর ইচ্ছা ;—বোলো কালীমা-ই কি জয়।

পালাদারের মুখ হাঁসিতে ভরে গেছে। কাঁচা কড়কড়ে টাকাগুলো চলে এলো তাঁর হাতে—এইবার মেয়েটার একটা কিছু হিল্লে করতে পারবেন তিনি। ভাবছেন, মা যে অন্তর্যামী ; সব ব্যবস্থাই করলেন তিনি।

মিশ্রমশাই ডাকছেন লছমন দুবেকে—আইয়ে বাবুজী টিকা লাগাইয়ে—মাইজী ইধার আইয়ে।

পালাদার মশাই হাত কচলিয়ে দাড়ালেন। দুবেজীর পাশে ভিড় সরিয়ে ফাঁকা করে দিলেন তাঁর আশপাশ থেকে। মায়ের গলার জবার মালা এনে পরিয়ে দিলেন যজমানের গলায়।

॥ একত্রিংশ ॥

কালীনাম জপ সমাপ্ত করে দিদিমা উঠে দাড়ালেন। বসে বসে কোমর ধরে গেছে তাঁর। সিধে হয়ে দাড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নিলেন। তার হাতে লাঠি-গাছা এগিয়ে দিলেন পাণ্ডা মশাই।

জবা ফুল আর বেলপাতা দিয়ে সুন্দর করে পূজা করলেন পাণ্ডা মশাই, আমাদের অঞ্জলী দেওয়ালেন। তারপর মায়ের সিঁথির সিঁদুর ছোঁয়ালেন দিদিমার সিঁথিতে।

চোখ বুজে মাথা নত করে প্রণাম করলেন তিনি। বৃদ্ধার বহু-দিনের সাধ মিটেছে। অন্তর দিয়ে কায়মনে প্রার্থনা করেছিলেন এই শুভ দিনটির। তাই তাঁর দুই চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মায়ের মন্দিরে। সে অশ্রু তাঁর দুঃখের নয়। মানুষ আত্মহারা হলেই তার অন্তর-তন্ত্রীতে আঘাত লাগে। সে তন্ত্রীর ঝংকার উঠে হৃদয় মাঝে। অব্যক্ত হৃদয়-আবেগ অশ্রু হয়ে দেখা দেয় নয়ন কোণে। সে আনন্দেই হোক, আর দুঃখেই হোক।

চতুর্দিক থেকে কালী নাম প্রবেশ করছে কর্ণকুহরে, পাণ্ডা আসছে, যাত্রী আসছে মন্ত্র পড়ছে 'কালী কালী' বলে। কেউ বলছে কালীমাইকি জয়—আবার কেউ বলছে জয় মা কালী করালিনী। শুধু কালী কালী নাম শুনছি চারিদিক থেকে।

ক্ষণেকের তরে মনটা হালকা হয়ে যায়। বড় তৃপ্তি, বড় আনন্দ। যেন ভিয়েনে-চড়ানো চিনির রসে দু' ফোঁটা দুধ ফেলে দিয়ে গাদ ময়লা কাটিয়ে দেয়! দর্শনে মুক্তি, স্পর্শনে মুক্তি, শ্রবণে মুক্তি।

মায়ের চরণ তল থেকে গঙ্গাজলসহ ফুল বেলপাতা তুলে আনলেন পাণ্ডামশাই। সেগুলো হাতের মুঠোয় রেখে জোরে চাপ দিলেন তিনি। তাঁর বুড়ো আঙ্গুল চুয়িয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন,—"মায়ের চরণামৃত"।

হাত কোস করে ভক্তিভরে মায়ের চরণামৃত গ্রহণ করলাম আমি। দিদিমা তাড়াতাড়ি চরণামৃতের দু' ফোঁটা তার দু' চোখে তুলে দিলেন, তারপর জিভের উপর দিলেন দু' ফোঁটা।

মায়ের প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকিয়ে চ্যাঙ্গারীতে রাখা হোলো আত্মপরিজনদের জন্যে। দিদিমা বললেন, এরই থেকে সবিতাকে দেব'খন। মা জগদম্বা তার মঙ্গল করুন।

মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা। দু'টি বড় দরজা দুদিকে। পুবমুখী আর দক্ষিণ মুখী। পুবমুখী দরজা দিয়ে প্রবেশ করে যাত্রী সাধারণ। দক্ষিণ মুখী দরজা উন্মুক্ত থাকে মাতৃদর্শনার্থীদের জন্যে। উত্তর মুখী হয়ে তারা দর্শন করে মাকে।

জ্যৈষ্ঠমাসের স্নানযাত্রা তিথিতে মায়ের পদাঙ্গুলী স্নান করানো হয় সমারোহ করে। ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর দুই পক্ষের বংশধর প্রবেশ করেন এই দরজা দিয়ে মায়ের মন্দির গহ্বরে। অন্য সবাই পুবমুখী দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন সেদিন। দুই তরফের বংশধর, পুরোহিত, মিশ্রমশাই, হালদারগুরু প্রবেশ করেন মায়ের মন্দির গহ্বরে। ভিতর দিক হতে মন্দির দরজা বন্ধ করেন তাঁরা। তারপর সাত পর্দা কাপড় বাঁধেন যে যাঁর নিজের চোখে। বার করেন মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলী লৌহ পেটিকা হাতে। সুগন্ধী তেল, ঘৃত, মধু, মাখান সেই পাষাণময় পদাঙ্গুলীতে; গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে মুছে-কুছে বিধি অনুসারে পুজো করেন তাঁকে। তারপর সযত্নে তুলে রাখেন সেই 'সতী-খণ্ড-অঙ্গ'।

স্নান-পর্ব্ব সারা হলে বেরিয়ে আসেন সবাই মন্দির ভিতর থেকে চোখের কাপড় খুলে। যিনি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন তিনি বের হন সেই দরজা দিয়ে।

মন্দির বাইরে এসে বংশধর দুজন আশীর্ব্বাদী ফুল নিয়ে দ্রুত চলে যান বাড়ীর দিকে, নিজ নিজ বংশের মঙ্গল কামনায়। কারো সাথে কথা কইবেন না তারা পথের মাঝে।

নিজেদের আত্মপরিজন যজমান ইত্যাদির ঠিকানায় পাঠান এই আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্য।

অম্বুবাচী তিথিতে, মাকে স্নান করানো হয় এইভাবে।

সাড়ে আঠারো হাত লম্বা, সাড়ে আট হাত চওড়া মন্দির গহ্বর-মাঝে মা বসে আছেন সকল সন্তানের পূজো নিতে। মন্দিরের চারিদিকের বারান্দা যাকে বলে জোড়া বাংলা উত্তর দক্ষিণ চওড়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ্ ফুট, পূর্ব্ব-পশ্চিমে পঞ্চাশ ফুট লম্বা। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় পঁয়ষট্টি ফুট।

এরই মাঝে মা আছেন ত্রিনয়নী-করালিনী মূর্ত্তি ধারণ করে। মায়ের মূর্ত্তি যেন জ্বলজ্বল করছে। হাত দেড়েক লম্বা সোনার জিভ্— রূপোর তৈরী অসুর-মুণ্ড ধরে রেখেছেন সোনার হাত দিয়ে। গলায় সোনার মুণ্ড মালা। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে ভয় করে। হাত জোড় করে আবার চোখ বুজলাম।

আত্মারাম আর ব্রহ্মানন্দ যে প্রস্তর খণ্ডের সাথে ভেসে এসেছিলেন এই কুণ্ডের হ্রদে—সেই প্রস্তরেই কালীমূর্ত্তি অঙ্কন করে বসানো হয়েছে এই বেদীতে—যে বেদীতে আত্মারাম বসে তপস্যা করেছিলেন ; যেখানে বসে পদ্মযোনী ব্রহ্মা তপস্যা করে অভীষ্ট ফল লাভ করেছিলেন। এই সেই বেদী। তার উপরেই মা বসে আছেন।

মায়ের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু সেই মহামূল্য পাথর খণ্ডের পরিবর্ত্তন হয়নি কোন কালে। মায়ের বেদীমূলকে তাম্র পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হোলো। লোহার শিক'এ খড় বেঁধে মাটির প্রলেপ দিয়ে মায়ের চার হাত তৈরী করলেন তাঁর ভক্ত সন্তানেরা—খড়্গ-মুণ্ডমালিনী-রূপে সাজানো হোলো মাকে।

মা সাজলেন। ছেলেরা যেমন সাজালো। সাজন-গোজনে মায়ের ভারী সখ—যাঁর যেমন সঙ্গতি তিনি তেমন সাজালেন মাকে। খিদিরপুরের ভূকৈলাসস্থ ঘোষাল রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ গোকুলচন্দ্র দেওয়ান মশাই দিলেন মায়ের চারখানা হাত রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে।

তার কিছুকাল পর সেই রূপোর হাতকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিলেন কলিকাতা নিবাসী কালীচরণ মল্লিক মশাই।

মায়ের হাত-ত' আর খালি রাখা সম্ভব নয়! এয়োস্ত্রী মায়ের চার হাতে চার গাছি স্বর্ণকঙ্কণ পরালেন—চড়কডাঙ্গার রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের স্বর্ণময় জিহ্বা প্রদান করলেন, পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। মস্তকোপরি স্বর্ণছত্র দিলেন নেপাল রাজের প্রধান সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর।

এসব কিন্তু কোলকাতা শহর পত্তন হবার পর। আদিতে কিন্তু মায়ের এ মূর্ত্তি ছিল না। ছিল শুধু ত্রিনয়ন-অঙ্কিত কালো পাথরখানি। সেই পাথরকেই পুজো করতেন সন্ন্যাসীরা। এসব অলঙ্কার গ্রহণ করার পূর্ব্বে মা স্বর্ণ অলঙ্কার গ্রহণ করেছেন রাজা মানসিংহর কাছ থেকে।

মা সেজেগুজে নতুন রূপ নিয়ে যেদিন নতুন মন্দিরে বসলেন, সেদিন পরলেন নতুন বসন আর ভূষণ। মহারাজ পেটিকা বোঝাই করে নিয়ে এলেন অলঙ্কার আর বস্ত্র—উপকরণ আর উপচার।

নবমূর্ত্তি ধারণ করলেন মা জগজ্জননী—সে সকল বসন ভূষণ পরে। মহারাজা মানসিংহের মন্দিরে বসে তাঁরই দেওয়া অলঙ্কার গ্রহণ করলেন তিনি প্রথম গৃহী-ভক্তর কাছ থেকে।

মাথায় মুকুট দিয়ে মা হলেন রাজরাণী, তারপর পরলেন হার, বালা, চুড়ী, রুলী, নথ, নাকছাবি আরো কত কি!

যার আছে, যাকে মা দিয়েছেন অনেক কিছু, তারই কাছে মা দাবি করেন। যে সক্ষম তার কাছে মা চাইবেন না-ত' চাইবেন কার কাছে? অক্ষম ছেলের জন্যই মাকে হাত পাত্‌তে হয় সক্ষম ছেলের কাছে। রামের কাছ থেকে নিয়ে শ্যামকে দেন মা।

মাকে দেওয়া স্বর্ণ অলঙ্কার গুলোইত' পালাদারের প্রাপ্য। নতুন অলঙ্কার এলেই পুরনো অলঙ্কার খুলে নেওয়া হয় মায়ের অঙ্গ থেকে। তারপর সে অলঙ্কার চলে যায় পালাদারের লোহার সিন্দুকে।

॥ বত্রিশ ॥

মন্দির প্রদক্ষিণ করে লাঠি ঠুকে ঠুকে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন দিদিমা। ভগবতী পাণ্ডা নামাচ্ছেন তাঁর হাত ধরে ধীরে ধীরে।

ঘোমটা দেওয়া একটি বধূ এগিয়ে আসছে এদিকে—অন্ধ স্বামীর হাত ধরে। ভিক্ষার আশায় হাত বাড়িয়ে রেখে গান গাইছে অন্ধ বেচারা—

"সকলই তোমার ইচ্ছা—
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি'ই করমা—
লোকে বলে করি আমি॥"

সিঁড়ির উপরেই থমকে দাঁড়ালেন দিদিমা। বধূটি ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। ধীরে ধীরে হাত বার করে ভিক্ষা চাইছে। ছিন্ন মলিন বসন দিয়ে মুখখানি কোন রকমে ঢাকা, বলল,—"আমায় কিছু ভিক্ষে দাও মা।" অনভ্যস্ত বলা-চাওয়ার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো ভয়ানক রকম। সেই কণ্ঠস্বরে দিদিমার বুকটাও কেঁপে উঠেছিল বোধ হয়।

সুন্দর গোলগাল হাতখানি একগাছি লোহার বালা দিয়ে তার এয়োস্ত্রীত্বটুকু বজায় রেখেছে বউটি।

—অন্ধস্বামী গাইছে—

—"আমি রথ তুমি রথী,
যেমন চালাও মা তেমন চলি।
কা'রে দাও মা অভয় পদ,
কারো কর মা অধোগতি॥"

গান থামিয়ে বলছে অন্ধ স্বামী—আমার জন্যইত ওর যত দুঃখ, সুখ ভোগ করল না কোন দিন। শুধু দিয়ে গেল, পেলনা কিছুই।

ওরা যে মায়ের জাত। শুধু দিতে আসে ; স্নেহ দেয়, ভালবাসা দেয়, ভক্তি দেয়, প্রেম দেয়—ওঁরাই ত শক্তি। তাইত' শক্তির কাছে বাঁধা পড়ে পুরুষ ; শক্তিহীনকে শক্তি যোগান দেয় ওঁরা—শক্তির হাত ধরে চলেছে অন্ধ স্বামী—গাইছে—আমি রথ, তুমি রথী।

চোখত্'টো ছলছলিয়ে উঠেছে বৃদ্ধা দিদিমার, কি দেবেন ঐ রিক্ত হস্তে, তাই ভাবছেন তিনি। তাঁর সঙ্কল্প ছিল আগামী মঙ্গলবার একজন এয়োস্ত্রীকে 'সধবা' করবেন তিনি। তাঁকে দেবেন শাঁখা, শাড়ী, তেল, সিঁদুর, আলতা। এই 'এয়োস্ত্রী-ব্রত' সারা করার বাসনা ছিল দিদিমার মনে। সেই কথা ভাবছিলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে।

পাণ্ডা মশাই ডাক দিলেন—সামনে এগিয়ে আসুন মা, সিঁড়িতে বড় বেশী ভীড়।

নাটমন্দিরের রকে বসে পড়লেন তিনি। বললেন, ও শিবু, ডেকে আন না ভাই ওই বউটিকে, দেখলে বুক ফেটে যায়। কচি মেয়ে মল পা'য়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াবার বয়স যায়নি এখনও, আহা-হা…। ওকেই আমি 'সধবা' করব আজ, এখানে। তুই ব্যবস্থা কর দাদাভাই।

ডাকশুনে তারা এসেছে দিদিমার সামনে—আশান্বিতা হয়ে বসে পড়েছে তাঁর কাছে।

ব্রতকরে তোমাকে যদি শাঁখা শাড়ী দান করি তাহলে তুমি তা' গ্রহণ করবে মা ?

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো বউটি। ধীরে ধীরে তার স্বামী বলছে,—মা মা' করে কেদেছে ক'দিন, তাই'ত মা পেলে। আমি মহাপাপী তাই মা পেয়েও মা দেখতে পেলাম না। এইত' আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। যেমন পাপ তেমন তার সাজা।

অবগুণ্ঠন সরে গেছে ভিখারিনীর মুখের উপর থেকে। দিদিমা দেখতে পেলেন তার মলিন মুখখানি। অনাহারে আর দুশ্চিন্তায় কচি মুখখানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ভিক্ষা ছাড়া তোমার কি আর অন্য কোন সম্বল নেই মা? প্রশ্ন করলেন দিদিমা।

আর কোন সম্বল নেই মাগো। সব সম্বল খুয়িয়ে মাকে ডেকেছি। মায়ের চরণে এসে আশ্রয় নিয়েছি অন্তিম সময়। রাখতে হলে মা'ই রাখবেন। মায়ের চরণ তলে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করি—অন্ধ স্বামীর হাত ধরে।...বড় উপদ্রব মা এখানে। হাত পেতে একটা আধলা পয়সা পাই বটে, তাও নিতে বড় ভয় করে।

ত্রিলোচন গাঙ্গুলী অনেক কিছু দিতে চেয়েছিল এই বউটিকে, বলেছিল, কি হবে বাছা, অন্ধ লোকের হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়ে। দুবেলা দুমুঠো ভাতের কথা দূরে থাক, একবেলাও পেটভরে খাওয়াতে পারে না; চোখওয়ালা লোকের হাত ধর, খেয়ে পরে বাঁচবে।

তার মুখে লাথি মেরে চলে এসেছে বধূটি মায়ের মন্দিরে। মন্দিরের আনাচে কানাচে ঘোরে আর মা মা করে ডাকে দিবা-নিশি। দিনান্তে মায়ের অন্ন ভোগ প্রসাদ খেয়ে স্বামীর হাত ধরে বাড়ী ফিরে যায়। এই তার শেষ সম্বল।

কত ভিক্ষুক পড়ে আছে মায়ের চরণে। কত দেশের কত লোক। পাটনাই, বিহারী, উৎকলি, তেলেগু, দ্রাবীড়, বাঙ্গালী, কত জাতের কতজন। এ যেন আলাদা আর একটা সম্প্রদায়; ভিক্ষুক সম্প্রদায়। প্রথমে দু'একজন রিক্ত ব্যক্তি এসেছিল মায়ের চরণে। বুভুক্ষু মানুষ মাথা নত করে ভিক্ষা করেছিল কালী-দর্শনার্থীদের কাছে। তীর্থে আসতেন পুণ্যকামীরা পুণ্যসঞ্চয়ের আশায়। দানধ্যান পুণ্যেরই অংশ, তাঁরা দান করতেন দু'হাতে। সেই দান গ্রহণের আশায় এসেছিল দীন-দরিদ্র দুঃখী মানুষেরা। দাতার আনাগোনা আছে বলেইত' দান-গ্রাহকের দেখা মেলে।· সেই যে সেকালে তারা এসে বসেছিল কালীমন্দিরের আনাচে কানাচে, আজও তারাই আছে। পুরুষানুক্রমে তাদেরই আধিপত্য চলছে ভিক্ষা কার্য্যে। তাদের একটা পৃথক রাজত্ব

আছে, রাজা আছে, সমাজ আছে, বিবাদ-বিসংবাদ আছে, বিচার আছে।

পথের ধারে গাছ তলায় মায়ের মন্দিরের আনাচে-কানাচে গঙ্গার ধারে তাদের ঘরবাড়ী। ছেঁড়াচট, ছেঁড়ামাদুর ইত্যাদি গৃহস্থের পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে তাদের সংসার পাতা। এক বিঘৎ স্থান নিয়েও তাদের বিবাদ চলে। ওদের কত বিবাদের মীমাংসা করেছেন বৈবাহিক সর্ব্বেশ্বর হালদার। অনেক সময় মামলার বিষয় তুলে দিয়েছেন সর্বাণীর হাতে।

মায়ের মত চৌকীতে আসন করে বসে, দুই পক্ষের আর্জ্জি শুনে মামলার নিস্পত্তি করেছেন দু'টুকরো জমি দান করে। তাদের অভাব মিটিয়ে স্থিতি করেছেন; সংসার বেধে গৃহস্থালী সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি—মন্দিরের আশে পাশে কালীঘাট ফার্স্ট লেন, (ভগবতী লেন) কালীলেন, মহামায়া লেনে আজও তারা বাস করছে সর্ব্বেশ্বর হালদারের গুণ কীর্ত্তন করে।

আজ সে-যুগের অবসান হয়েছে। একালে তাঁরা জমি দান করেন না। বেঁচে নেই সর্ব্বেশ্বর হালদার। আছে তাঁর বংশধরেরা, তাঁরা সে জমি হস্তগত করবার ফিকির করছে নানান ভাবে। কতজনারে উৎখাত করেছেন এরই মাঝে। কতজনারে দিয়েছেন সুনজর। সুনজর ঘোলাটে হয়ে দেখা দিয়েছে একদিন। সে-নজরে বাধা দিতে পারেনি কেউ। দেবেন কে? যিনি বাধা দেবেন তাঁরও যে ঘোলাটে নজর।

যেন শৃগালের নজর। পথের মাঝে যাদের ঘর সংসার, বংশানুক্রমে মৌরসী পাট্টার দখল পেয়ে আসছে যারা—যাদের জন্মমৃত্যু সেই পথের বাঁধা সংসারে—তাঁরাও সে নজর এড়াতে পারেনি।

পথে বাঁধা সংসারে তাদের পুত্র কন্যা জন্মাচ্ছে—আবার মরছেও

পটাপট। যারা না মরে বেঁচে থাকে তাদের বয়স বাড়ে ধীরে ধীরে। জ্ঞান হলেই তারা দেখে ভিক্ষা,—যাত্রী,—পাণ্ডা—কালী মন্দির—আরো কত কি ?

দিনে দিনে তারা ভিক্ষের আছিলা শেখে—কায়দা-কানুন শেখে। ভিক্ষাই তাদের জীবন-সাধনা, এই তাদের ব্রত। ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েই তাদের জীবন শেষ হয়। তারপর তারা একদিন মরে বাঁচে।

কিন্তু মেয়েগুলো ? তাদের কিন্তু এত সহজে মৃত্যু হয় না। তারা মরে ঠিক-ই, তবে ধীরে ধীরে তিলে তিলে। এদের উপর থাকে শৃগালের দৃষ্টি, এ'বড় ভয়ানক দৃষ্টি। রাতের অন্ধকারে ধূর্ত্ত শৃগাল বার হয় শিকারের লোভে। সামান্য খাবারের লোভ দেখিয়ে তাদের টেনে নিয়ে আসে ঘরের বাইরে। তারপর তার রক্ত খেয়ে আধ-খাওয়া ক'রে হাড় মাস ফেলে রাখে পথের পরে।

দাতা আসেন কালীঘাটে দানের সঙ্কল্প নিয়ে। মাকে দর্শন করেন, তারপর তাঁরা দান করেন টাকা পয়সা, কাপড় চোপড়। এমন কি জমিজমা পর্য্যন্ত।

একবার এক ধীবর জমিদার এসেছিলেন কালীঘাটে দানের সঙ্কল্প নিয়ে। একজন ব্রাহ্মণকে ভূ'দান করবেন—জমিদান করবেন তিনি। জমিদার গিন্নীর ভীষণ ব্যাধি। একেবারে মরণাপন্ন অবস্থা। ডাক্তার বদ্যি সব হয়রান হয়ে গেছে। এমন দিনে মা তাকে দেখা দিলেন। বললেন,—"কালীঘাটে এসে আমাকে পুজো দে, তারপর, আমার কোন সেবক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভূমি দান কর, গো-দান কর, এতেই তোর মঙ্গল হবে।'

লক্ষণ বাঁড়ুয্যে একজন সৎব্রাহ্মণ সন্তান। নবদ্বীপ থেকে এসেছেন কালীঘাটে ভিক্ষার আশায়। চিরকাল পুঁথি মুখস্থ করেছেন। শাস্ত্রবাক্য আওড়েছেন। ' অন্নবস্ত্রের চিন্তা করেন নি কখনও। যার আহ্বান নেই, যার যত্ন নেই, সেই-বা আসবে কেন আপন ইচ্ছায় ? তাই অন্ন বস্ত্র স্বইচ্ছায় আসেনি কোন দিন তার কাছে।

এদিকে সংসার বেঁধেছেন। সংসারের পোষ্য বৃদ্ধি হচ্ছে সময়মত। কিন্তু তাদের ভরণ পোষণ? ব্রাহ্মণ চিন্তায় পড়লেন একদিন। তিনি চলে এলেন কালীঘাটে চিন্তামণির চরণে। যদি কোন উপায় হয়।

ব্রাহ্মণী কিন্তু পণ্ডিত নন, তিনি বুদ্ধিমতী। স্বামীকে অনুরোধ করেন কালীঘাটে নাটমন্দিরে শিলা-শালগ্রাম নিয়ে পূজো করতে। কত ব্রাহ্মণত' বসেন সেখানে—পূজো করেন যাত্রী সাধারণের নৈবেদ্য। দু'একপয়সা দক্ষিণা যা পান তা দিয়েই তাঁদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেন।

লক্ষণ বাঁড়ুয্যে বসেছেন তেমনি করে—নাট মন্দিরে শিলা-শালগ্রাম নিয়ে।

পূজোর নৈবেদ্য হাতে করে আসেন গৃহস্থ রমণীরা, কাতরভাবে তাঁদের ডাকেন পুরোহিত মশাইরা—"আসুন মা আসুন এইদিকে"। বলে, সম্মুখের স্থানটুকু গঙ্গাজল ছিটিয়ে মার্জনা করেন। এক সাথে ডাকে সবাই। হাত বাড়ায় সবাই এক সাথে নৈবেদ্য পূজোর আগ্রহ নিয়ে।

যিনি পূজো দিতে আসেন তিনি পড়েন মহাদ্বিধায়। কাকে বাদ দিয়ে কার সামনে রাখবেন পূজোর নৈবেদ্য। তবুও তাঁদের রাখতে হয় একজনের সম্মুখে—আর পাঁচজন দেখেন হাঁ'করে। সারাদিন তাদের চাইতে হয়, ডাকতে হয়—"আসুন মা আসুন" বলে। হাত পাততে হয় যজমানের কাছে।

থেকে থেকে অনেক কিছু শিখেছেন লক্ষণ বাঁড়ুয্যে। আজ তিনি অন্নবস্ত্রের চিন্তা করছেন, চোখবুজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন— মাগো, ক্ষুধায় কাতর হয়েছি আমি, খেতে দাও। ব্যাস্, এইটুকু, এর বেশী আর কিছু বলতে পারেন না লক্ষণ বাঁড়ুয্যে।

সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ক্ষুধা মেটালেন মা। হুগলী জেলার সেই ধীবর রাজার হাত দিয়ে কিছু পাঠিয়ে দিলেন তিনি। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ করেছিলেন।

আজও বেঁচে আছেন তিনি। ধনে জনে মান প্রতিপত্তিতে তিনি একজন মহাশয় ব্যক্তি। রাজবাড়ীর পুরোহিতের পদ পেয়েছেন লক্ষ্মণ বাড়ুয্যে।

সব-ই মা করালেন। তিনি কারো দৈন্য ঘোচান, আবার কারে ফেলেন দৈন্যদশায়। এককালে তাঁকে যারা বলত বোকা পণ্ডিত, আজকাল তারাই বলে মহাপণ্ডিত। সব-ই মায়ের ইচ্ছা।

দিদিমা 'সধবা' করবেন সেই অন্ধের স্ত্রীকে। মাই-ত' যোগাযোগ করালেন।

জোড় আসন করে বসেছেন সেই রমণী। দিদিমা তাকে লালপেড়ে শাড়ী পরিয়েছেন, দুহাতে পরিয়েছেন শাঁখা। নিজের অঞ্চল প্রান্ত দিয়ে যত্ন করে বউটীর মুখখানি পুঁছিয়ে দিলেন—তারপর তাঁকে প্রণাম করলেন দিদিমা।

প্রণাম কি করতে দেয়! দিদিমার হাতদু'খানি জড়িয়ে ধরল সধবা-টি। বলে,—"কর কি মা, আমি যে জাতে···

থাক্ থাক্ বলে, বাধা দিলেন দিদিমা। আমার সাধ অসম্পূর্ণ রেখ না বাছা! তুমি যে মা—তোমাকে মা বলে ডেকেছি, মা ভেবেই পূজো করেছি তোমাকে। তুমিও যে জাতের আমিও যে সে জাতের। তোমার আমার একই জাত। তুমি যে আমার কাছে সতী-সাবিত্রী সধবা মা।

তবুও কি পারে প্রণাম করতে! কত সাধ্য সাধনা করে তার পায়ে হাত দিয়ে আলতা পরিয়েছেন। তার উপর আবার প্রণাম!

দিদিমা বললেন—সতীকে পুজো করার অর্থ-ই-ত শিবাণীকে পূজো করা। বড় ভাগ্যে তোমায় পেয়েছি মা, কত বছর অপেক্ষা করে আছি, কালীঘাটে আসব, মা কালীকে দর্শন করব-'সধবা' পূজো করব। আজ আমার সেই সাধ পূর্ণ করলে মা তুমি, তোমাকে প্রণাম করব নাত' প্রণাম করব কাকে?

॥ তেত্রিশ ॥

পাণ্ডা ভগবতী ভট্টাচায্যি মশাই বয়সেই শুধু প্রবীন নন; জ্ঞান বুদ্ধিতেও প্রবীন হয়েছেন তিনি। তিন পুরুষ ধরে যজমানি করছেন—কত শত যজমান দেখেছেন, আজও দেখছেন দিদিমার মুখের দিকে চেয়ে—ঠায় চেয়ে আছেন সেই দিকে।

নাটমন্দিরের সিঁড়ির উপর বসেছেন তিনি। আমিও বসে আছি তাঁর পাশে। বলছিলেন,—এই ছুটীকথা কে বোঝে? মা আর সন্তান;—সন্তান পূজো করবে তার মাকে। এ'পূজোতে আর আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হলে যখন তখন পূজো করা যায় মাকে। সত্যিই যদি মাকে মা বলে' মনে করে থাক তবে তাঁকে মায়ের মতোই পূজো করা উচিত। তিনি কী চান? কিসে খুসী হন এটুকু জানা থাকলে আর কোন কথাই থাকে না।

সর্ব্বেশ্বর হালদার মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করতেন, ঠিক গর্ভধারিণী মায়ের মত। সর্বাণী তাঁর বড় মেয়ে; মেয়ের বিয়ে পাকাপাকি হয়ে যাবার পর আরো ছু'দিন সময় হাতে রাখলেন তিনি। বললেন মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দিন স্থির করবেন। তাঁর জগজ্জননী মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কোন মাঙ্গলীক অনুষ্ঠান করেন না। মা-কালীর অনুমতি পেয়ে সর্বাণীর বিয়ে ঠিক করেছিলেন তিনি।

কন্যার বিয়ের সাতদিন পূর্ব থেকেই বাড়ী ভরে গিয়েছে আত্মীয় স্বজনে—কত লোক আসবে, কত লোক দেখবে সর্বাণীর বিয়ে। এমন দিনে মা থাকবেন সাদামাটা পোষাকে! তাই কি হয়? মায়েয় জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে ভাল লালপাড় গরদের শাড়ী আনালেন সর্বেশ্বর হালদার।

বেনারসী পরে বিয়ের সাজ সেজেছে সর্বাণী। সারা অঙ্গে তার কত

গহনা। হাত বোঝাই চুড়ী, তাগা, গলায় হার, কপালে টায়রা, পায়ে তোড়া, কোমরে বিছে—কত সব। বিয়ে উপলক্ষ্য করে কত কাপড়-চোপড়, গয়না-গাটি এলো মেয়ের জন্য। বাপ আনলো মেয়ের জন্য—কিন্তু বেটা কি আনলো মায়ের জন্য ?

আনলো বৈ কি ?

মায়ের জন্য চারগাছা মোটা দেখে হাঁত্তির দাঁতের শাঁখা বাধিয়ে আনলেন সোনা দিয়ে। নতুন কাপড় খানকতক। অন্দর মহলে যেমন অনুষ্ঠান চল্‌লো, মায়ের মন্দিরেও তেমন অনুষ্ঠান করলেন হালদার মশাই। গুরু বাড়ী পাঠালেন তিনি মস্ত বড় একটা সিধে। দশজন লোক তা বয়ে নিয়ে গেল। বল্‌লেন,—পারের কড়ি জমা রাখলাম কাণ্ডারীর হাতে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসবার আগে মেয়েকে নিয়ে এলেন হালদার মশাই মায়ের মন্দিরে—হালদারগিন্নীও এলেন তার সাথে। তিন জনে এসে দাড়িয়েছেন মায়ের মন্দিরে কিছুক্ষণের জন্য। পাহারাদার বাইরে অপেক্ষা করে ভিড় রক্ষা করে। অনুরোধ করে যাত্রী সাধারণকে—কিছুক্ষণের জন্য মন্দির-বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তাদের।

কন্যাকে মাঝে রেখে ছু'দিকে দাঁড়ালেন জনক-জননী। হাত জোড় করে তাঁরা অনুমতি চাইলেন মায়ের কাছে—বল্‌লেন, তোমার সর্বাণী বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছে, তাকে আশীর্ব্বাদ কর মা। চোখ বুজে তিন জনেই প্রণাম করলেন মা ভবানীকে।

সন্ধ্যায় আরতি হয়, মায়ের শীতল ভোগ হয়; দুধ, ক্ষীর, ছানা দিয়ে। বিয়ে উপলক্ষ্য করে হালদার মশাইয়ের বাড়ী কত খাদ্য সামগ্রী, কত মিষ্টান্ন, কত লোকজন। সাধারণের তুলনায় সেদিন সবই অসাধারণ।

মায়ের ভোগ সেদিন কেন সাধারণ থাকবে ? তাঁর ভোগেরও রকম ফের হোলো। ছানা, দুধ, ক্ষীর দিয়ে তৈরী হোলো হরেক রকমের মিষ্টান্ন। শুদ্ধাচারে পৃথকভাবে তৈরী হোলো মায়ের নৈবেদ্য।

নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে মায়ের জন্য লুচি ভাজালেন হালদার মশাই। তারপর মাকে নিবেদন করলেন সব কিছু। মন্দির মাঝে সাজালেন থাকে থাকে খাদ্য-সামগ্রী—লুচি, হালুয়া, সর-ভাজা, সর-পুরিয়া, সরের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, ছানার বরফি, ছানার পায়েস, সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা আরো কত সামগ্রী।

এমন করেই মাকে ভালবাসতেন সর্বেশ্বর হালদার। ভোগের ঘরে গিয়ে বলতেন, পাচক ঠাকুরকে, এবার গরমটা বেশ পড়েছে হে ঠাকুর মশাই, মাকে কাল ভিজে ভাতের ভোগ দেওয়া হবে, সেই বুঝে অন্যান্য সব ব্যঞ্জন তৈরী কোরো।

শীতের দিনে প্রায়ই খিচুড়ী ভোগ দিতেন তিনি, কখন দিতেন পোলাও। বলতেন, এত ঠাণ্ডায় মা কি ঠাণ্ডা জিনিষ খেতে পারবেন? মায়ের সব খাদ্য-সামগ্রী যেন গরম করে দেওয়া হয়।

সূর্য্য উদয়ের সাথে সাথে মায়ের পূজো সুরু হয় মন্দির গম্ভীরে। এ পূজো হয় সেবায়েতের তরফ থেকে। তারপর আসে মায়ের অগণিত ভক্ত সন্তান। আসে নৈবেদ্য হাতে নিয়ে। পুষ্পাঞ্জলী দেয়, নৈবেদ্য নিবেদন করে। মা হাত পেতে নিচ্ছেন সকলের সব কিছু উপহার। ডাক শুনতে শুনতে পূজো নিতে নিতে বেলা গড়িয়ে যায়। বেলা তিন প্রহরে মা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। মায়ের তখন আলুথালু বেশ, গরমে ঘেমে উঠেন, তাঁর অঙ্গের বেশভূষা ঠিক থাকে না তখন।

ঠিক এমন সময় মন্দির বন্ধ থাকে কিছুক্ষণের জন্য। মা তখন সেবায় বসেন। তাঁর ভোগ নিবেদন করেন পুরোহিত মশাই। সেবাইত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন মায়ের কাছে। মায়ের সেবা না হলে তিনি কিছু মুখে দেন না।

মন্দির বাইরে অপেক্ষা করে ভক্তবৃন্দ। মায়ের একটু প্রসাদ পাবার আশায়। সর্বেশ্বর হালদারের যে দিন পালা থাকে, সেদিন প্রসাদ পাবার কোন বাধাই থাকে না। কনিকামাত্র প্রসাদ পেয়ে চরিতার্থ হয় তারা।

মায়ের ভোগের পর আসে দরিদ্র-কাঙাল, অনাথ-আতুর যারা পড়ে থাকে মায়ের মন্দিরকে আঁকড়ে ধরে—তারা এসে বসে মন্দির চত্বরে সারি বন্দী হয়ে। মায়ের ভোগ খায় তারা, পাণ্ডারা যাত্রীদের দেখায় "কাঙালী-ভোজন"। এ প্রথা চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর আমল থেকে।

যত কাঙাল বাড়ে মায়ের চত্বরে—ভোগের ঘরে চালের মাত্রা ততোই বাড়তে থাকে। সর্বেশ্বর হালদার মশাই বলতেন—দু মন চালে যদি না কুলান হয়, তবে আড়াই মন হবে, তিন মন হবে। মায়ের কাঙাল ছেলেরা যেন খেতে পায় পেটভরে। তারা খেতে না পেলে যে মা অসন্তুষ্ট হবেন। আমি সেবায়েত, মায়ের ভাণ্ডার রক্ষা-কারি, তাঁর হুকুম তামিল করি। তাঁর ক্ষুধার্ত ছেলেরা খেতে না পেলে আমার হাত থেকে মা ভাণ্ডারের চাবি কেড়ে নেবেন— বুঝলে পাচক ঠাকুর? কার্পণ্য করো কার জিনিস? যার জিনিস, তিনিই যোগাবেন—আমারা একটু দেখে শুনে করে কর্ম্মে দিই, এই যা। তাই আমরাও চাট্টি খেতে পাই, কি বল হে পাচক ঠাকুর? "এজ্ঞে হ্যাঁ, তাইত'।"

সাদাসিদে সরল মানুষ সর্বেশ্বর হালদার, জ্ঞানে গুণে আদর্শ হয়েছিলেন সকলের কাছে। চালে চলনে, কথাবার্ত্তায় ছিলেন অদ্বিতীয়। হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল; দয়া দাক্ষিণ্যে যেমন সহৃদয়তা দেখাতেন—তেমন শাসনে ছিলেন বজ্র কঠিন।

বর্ত্তমানে সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের কথা না বলাই ভাল। কী দরকার তাদের কথা উল্লেখ করে? বুড়ো বয়সে চোখ রাঙ্গানি দেখবার সখ্ নেই আমার।

তাঁদের জীবনটা যে ভাবে সুরু করেছিলেন, যে ভাবে তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনটাকে মধুময় করে রাখতেন, তেমন করে এঁরা পারবেন কি করে? সে যে মায়ের দেওয়া মধু, আজকাল তাঁরা সে মধু পাবেন কোথায়? মা যে অসন্তোষ

এঁদের প্রতি। বিবাদ-বিসংবাদে তাঁদের সংসার যে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। অশান্তি ঘিরে ধরেছে তাঁদের। মধু বঞ্চিত এঁরা। যিনি সে দু'চার ফোঁটা মধু পেয়েছেন—তাঁদের জীবনটাও আছে মধুময় হয়ে। চির-শান্তি বিরাজিত তাঁদের সংসার। স্বভাবে-চরিত্রে আজও তাঁরা অনুসরণ করেন পূর্বপুরুষের পথ—এইটুকুই মায়ের দান।

॥ চৌত্রিশ ॥

মায়ের প্রথম গৃহী-সেবাইত ছিলেন ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি ছিলেন বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত। এই বৈষ্ণবকে দয়া করলেন মা। মা যে পরম ব্রহ্ম—সকল মন্ত্র-তন্ত্র, সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের উর্দ্ধে তিনি। মা বলেন —"সবই আমি, আমাতেই সব। আমিই কালী আমিই কৃষ্ণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু সব ই আমি।"

বৈষ্ণব ভবানীদাসকে মা ভাল বাসেন। তার ভাল বাসায় মা যে মুগ্ধ হয়েছেন। জন্ম-জন্ম ধরে যে ছেলে মাকে ভাল বেসেছে, কেঁদেছে মায়ের কোল পাবে বলে—সে ছেলেকে কোল না দিয়ে পারেন কোন মা? ভবানীদাসকে একান্ত কাছে ডেকে নিলেন তিনি। বল্লেন—"তুই নিজে হাতে সেবা কর আমাকে, তা যেমন ভাবেই পারিস। কত জন্ম সাধনা করেছিলি, তার ফল এ জন্মে পেলি বৎস।" চার হাত প্রসারিত করে মা কাছে টেনে নিলেন ভবানীদাসকে।

মায়ের ডাকে এলেন ভবানীদাস,—পৈতৃক গৃহদেবতা বাসুদেব আর শিলা শালগ্রাম নিয়ে। মায়ের পাশে ঠাঁই হোলো তাঁদের। দুই শক্তির পূজো হোলো পাশাপাশি। দুই মন্ত্র দিয়ে পূজো করলেন ভবানীদাস। শক্তি মন্ত্র, আর বিষ্ণু মন্ত্র।

ভুবনেশ্বর গিরি ছিলেন শক্তি মন্ত্রের উপাশক। তাহ'লে কি হবে?—তা'বলে তিনি বামাচারী কাপালিকদের মত বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন না। বিষ্ণু-প্রেম-ভাব বশতঃ তিনি স্বয়ং কিছু শিলা-শালগ্রাম সংগ্রহ করে এনে রেখেছিলেন মায়ের মন্দির মাঝে—যা আজও সকলের দৃষ্টি গোচর হয়।

ভুবনেশ্বরের একমাত্র জামাই ভবানীদাসের হাতে মায়ের সেবার ভার তুলে দিয়ে তিনি যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন,—মাও তেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তাঁর বরপুত্র ভবানীদাসের সেবা পেয়ে। তিনি একদিন ভক্ত

ভুবনেশ্বরকে আদেশ করেছিলেন—'ওরে, একজন গৃহীর খোঁজ কর—গৃহীর হাতে সেবা পেতে, গৃহীর পুজো পেতে আমার ভারী সাধ হয়েছে।' ভবানীদাস মায়ের সে সাধ মেটালেন। নিজ হাতে মায়ের ভোগ রন্ধন করে নিবেদন করতেন তাঁকে। রাঁধ্‌তেন—অন্ন, পঞ্চব্যঞ্জন, মিঠাই মণ্ডা। নিরামিষ ভোগ দিতেন তিনি। তাতেই মায়ের তৃপ্তি। পরম তৃপ্তিতে মা আহার করতেন ভবানীদাসের নিজহাতে রন্ধন করা অন্নব্যঞ্জন ভোগ ; মায়ের সব কাজ তিনি করতেন নিজ হাতে। পুজোর জোগাড় থেকে পুজোকরা, ভোগ রন্ধন, ভোগ নিবেদন, ইত্যাদি সব কিছুই একা করতেন ভবানীদাস। দ্বিতীয় স্ত্রী উমাকে ছুঁতে দিতেন না কিছুই।

আমিষ ভোগে মায়ের যেমন তৃপ্তি, নিরামিষেও তেমন। মায়ের অন্তরে কথা শুনতে পেত তার একান্ত নিকট সন্তান।—"আমার ভবানীদাস যেদিন আমিষ খাবে আমিও সেদিন তার হাতে আমিষ খাব"। একথা নাকি ভবাণীদাস শুন্‌তে পেয়েছিলেন—মায়ের একান্ত কাছে থেকে।

দুর্গোৎসবের সময় মহানবমীর দিনে তিনি একটিমাত্র ছাগ বলি দিতেন মায়ের উদ্দেশে।

নিত্য পুজোয় মায়ের আমিষ ভোগ হোতো—সমাগত যাত্রীদের উৎসর্গ করা প্রথম বলি দিয়ে। আমিষ ভোগের জন্য ভবানীদাস কোন আয়োজন করেন নি। আয়োজন করতেন, দেশের ধনাঢ্য সন্তানেরা। পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুর বহুকাল মায়ের আমিষ ভোগের ব্যয় নির্বাহ করেছেন। কামদেব গাঙ্গুলীর বংশধর বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের অভ্যুদয়ের সময় তারা মায়ের নিত্য পুজো পাঠাতেন।

ভবানীদাস যখন বৃদ্ধ হলেন—তখন তার ভরা সংসার কানায় কানায়। এই ভরা সংসারে একদিন টাল্ খেয়ে গেল। প্রথম পক্ষের দুই সন্তান যাদবেন্দ্র আর রাজেন্দ্র ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন পরলোকে। শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন ভবানীদাস। 'একি করলে মা জননী"— ?

মা বললেন—"তুমি সংসারী, সংসারের সবকিছু জ্বালা ভোগ করতে হবে তোমাকে।"

আসলের সুদ্ রামকৃষ্ণকে কাছে ডাকলেন ভবানীদাস—যাদবেন্দ্রর পুত্র রামকৃষ্ণ। রাজেন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান। পৌত্র রামকৃষ্ণের হাতে মাতৃসেবার ভার দিয়ে তিনি বিশ্রাম নেবেন ঠিক করলেন।

চমকে উঠল রামকৃষ্ণ! "বল কি দাদু? মাকে সেবা করার ভার না হয় নিলাম—কিন্তু পুজোর মন্ত্রতন্ত্র? সেত' জানিনে কিছুই!"

কিন্তু মায়ের সেবার ভার তোকেই নিতে হবে। মায়ের সেবার ভার পৌত্রের হাতে তুলে দিলেন ভবানীদাস। শিলা শালগ্রাম পৈতৃক পঞ্চদেবতা নিয়ে রাখলেন পৃথক মন্দিরে—সেখানে স্থাপন করলেন রাধামাধবের যুগল মূর্তি। বাসুদেব-সহ গৃহের পঞ্চদেবতার সাথে রাধামাধবের পুজো চলছে আজও।

দুই মন্দিরে দুজন পুরোহিত নিযুক্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। আজকের পুরোহিত মশাইরা তাঁদেরই বংশধর।

ভবানীদাসের বার্ধক্য দশার পর থেকে গোটাকতক উইপোকা প্রবেশ করেছে তাদের মাঝে। দূরদর্শী ভবানীদাস বুঝেছিলেন যে, এই ধ্বংসকারী পোকা একদিন সব কিছু কেটে কুটে তছ্‌নছ্‌ করে দেবে। তাই সুরু থেকে তার আটঘাট বেঁধে, বিধি-নিষেধের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর প্রথম পক্ষের পৌত্র রামকৃষ্ণ। আর দ্বিতীয় পক্ষের পৌত্র রাঘবচন্দ্রের চার পুত্র—রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামনারায়ণ, আর রামশরণ। এই পাঁচ পৌত্রের মাঝে মায়ের সেবার পালা ভাগ করে দিলেন, প্রত্যেককে মাসে ছ'দিন হিসাবে। সম্পত্তি এবং উপসত্ব সমান অংশে পাঁচ ভাগ করে দিলেন তাদের মাঝে। সেদিন তাঁরা বৃদ্ধপিতামহের মীমাংসা এবং ভাগ বাঁটোয়ারা মেনে নিয়েছিলেন খুসী মনে।

বৃদ্ধপিতামহের অবর্ত্তমানে পাঁচ পৌত্রের মাঝে উইপোকার কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিল। তারা চাইল অতীত ঐক্যকে ধ্বংস করে দিতে।

তরফ হোলো দু'টো।- ছোট তরফ আর বড় তরফ। মেজো পুত্র রাজেন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ায় সে তরফ মিশে গেছে প্রথম পক্ষের সাথে, অর্থাৎ বড় তরফের সাথে। এদিকে রামকৃষ্ণ একা অর্দ্ধেক, আর ওদিকে চার ভাই একত্রে অর্দ্ধেক।

এতেও রামকৃষ্ণের মনঃপুত হোলো না। তিনি চেয়েছিলেন ষোলো আনা অংশই নিজের কোলে টেনে নিতে। পিতামহের জীবদ্দশায় মনের বাসনা প্রকাশ করতে পারেন নি। সে বাসনা মনে চেপেই জ্যেষ্ঠ হিসাবে মায়ের সেবা করে আসছিলেন।

সতের'শ বেয়াল্লিশ সালে বাংলার বুকে সুরু হোলো মারাঠা উপদ্রব। বিশ হাজার বর্গী সেনা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ভাস্কর পণ্ডিত আর তেইশ জন মারাঠা সর্দার।

বাংলা দেশটার উপর মারাঠাদের ভারী লোভ। তাকে জয় করে নাগপুরের সাথে জুড়ে দেবার বাসনা তাদের। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুতেই তাদের সব কিছু অগ্রগতির বাধা পড়ে গেল। তখন সেনাপতিদের পোয়াবারো,—যে যার আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিলেন।

শিবাজী জীবিত থাকা কালে দিল্লীর বাদশাহ স্বীকার করেছিলেন রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বা চৌথ মারাঠাদের দেওয়া হবে।

সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার নবাব আবিবর্দ্দীর কাছে সেটা চেয়ে পাঠালেন।

আলিবর্দ্দী তা'দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, এতটুকুও দেওয়া সম্ভব হবে না।

কি ? দেবে না! আচ্ছা ঠিক হ্যায়। আর কিছু বললেন না ভাস্কর পণ্ডিত। জোর যার মুল্লুক তার। বর্গী সর্দার বললেন—সব কিছু ছিনিয়ে নেব। বিশ হাজার বর্গী সেনা

বাংলার বুকের পাঁজড় ব্যথা করে দিল—ছুটোপুটি লুঠ্পাঠ্ আর অত্যাচার করে।

কালীঘাটে এলেন মারাঠা সর্দার—বললেন, "এসব আমার লুঠের সম্পত্তি কিন্তু এ দেবস্থান, ছেড়ে দিয়ে গেলাম। কে পাণ্ডা এখানকার ?

"আমি। আমিই পাণ্ডা এখানকার।" কাঁপ্তে কাঁপ্তে বললেন রামকৃষ্ণ।

তাঁকে মারাঠা সর্দার এক পাঞ্জা লিখে হাওলা করে দিলেন—'কালীঘাট আর কালী মন্দির।' হাওলা থেকে 'হালদার' হলেন রামকৃষ্ণ পাণ্ডা—পাঞ্জার বলে হলেন বলীয়ান।

ব্যাস, আর তাকে পায় কে ? সুযোগ পেয়ে এই পাঞ্জার জোরে রামকৃষ্ণ বঞ্চিত করতে চাইলেন ওপক্ষের চার ভাইকে।

চারভাই পড়লেন মহামুশ্কিলে—কি করা যায় ? রামকৃষ্ণ মারাঠা সর্দারের পাঞ্জার বলে একাই একশ হয়ে উঠেছেন। ওপক্ষের বড়ভাই রামগোপাল বল্লেন—"ঠিক আছে। থাক তুমি পাঞ্জা নিয়ে। আমি মায়ের আসল জিনিস নিয়ে আসব ছিনিয়ে,—সেই হবে মায়ের আসল পাঞ্জা।"

একদিন রাত্রে চার ভাই একত্রে মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলী জোর করে আনতে গিয়ে এক খণ্ড-যুদ্ধ বাধিয়ে বসলেন। রামকৃষ্ণ বাধা দিলেন চারভাইকে—সতী-অঙ্গ নিয়ে যেতে দেবেন না কিছুতেই। ফলে হোলো হাতাহাতি, মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলী ভূমিতে পড়ে গেল হাত থেকে। পড়াত' পড়া, একেবারে দু'টুকরো হয়ে গেল সতী-অঙ্গ। এক টুকরো নিয়ে পালালেন রামগোপাল ইত্যাদি ভাইয়েরা। বাড়ীতে নিয়ে যত্ন করে রাখলেন সে সতী-অঙ্গ।

বাকী টুকরো তুলে রাখলেন রামকৃষ্ণ মায়ের মন্দিরে লোহার পেটিকাতে চাবিবন্ধ করে। যথাস্থানে রইল মায়ের অঙ্গ।

রামগোপাল দম্ভ দেখিয়ে জোর জুলুম করে সতী-অঙ্গ নিয়ে গেলেন

বটে, কিন্তু রাখতে পারলেন না বেশী দিন। চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে গেল, কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শয্যা নিলেন অল্পদিন পরেই।

হরচন্দ্র ওরফে হরো বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামগোপালের জামাই। তিনি বেড়াতে আসতেন মাঝে মাঝে—খুড়শ্বশুর রামকৃষ্ণ হালদারের বাড়ী। এ সকল মনোমালিন্যের পর তিনি আসতে সুরু করলেন আরো ঘন ঘন। প্রায়ই আসতেন রামকৃষ্ণ হালদারের কাছে। কথায় কথায় শ্বশুর কুলের নিন্দা-মন্দ করতেন তাঁর কাছে। কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করছেন রামগোপাল; আলোচনাপ্রসঙ্গে একথাও বলতেন হরো বাবু।

তোমার শ্বশুরের ব্যবহার অত্যন্ত হীন, জঘন্য।—বলতেন খুড়শ্বশুর রামকৃষ্ণ।

একদিন পাঞ্জার সর্ত্ত নিয়ে আলোচনার সময় খুড়শ্বশুর মশাই মারাঠি সর্দারের দেওয়া পাঞ্জা দেখালেন হরো বাঁড়ুয্যেকে। একখণ্ড কাগজে মারাঠা সর্দারের লিখে দেওয়া 'হাওলা' উল্‌টে পাল্‌টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন হরো বাবু।

রামকৃষ্ণ বললেন,—তোমার শ্বশুররা চার ভাই, আমি একা···আরে কর কি, কর কি ! ··উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

হরচন্দ্র মারাঠা সর্দারের দেওয়া 'হাওলা' পত্রখানা মুখে পুরে চিবিয়ে চিবিয়ে একেবারে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিলেন।

একি সর্ব্বনাশ করলে তুমি বিশ্বাসঘাতক, শয়তান, ঠগ্ ! ক্ষিপ্ত হয়ে অনর্গল বকতে লাগলেন রামকৃষ্ণ।

আর বকা ! সে পাঞ্জা ততক্ষণে হরোবাবুর পাকস্থলীতে আত্মগোপন করেছে। তিনি এক পা দু'পা করে পিঠটান দিলেন খুড়শ্বশুরের বাড়ী থেকে।

অবস্থা ভাল নয় বুঝতে পারলেন রামকৃষ্ণ। মহা সংকটের দিন ঘনিয়ে এসেছে তাঁর। এই সংকটের দিনে তিনি এক যোগী গুরু পেলেন। তাঁর নির্দেশে সংকট মুক্ত হলেন রামকৃষ্ণ হালদার। বিবাদ মিটিয়ে নিলেন তিনি। মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলী আবার একত্রিত

হোলো। মায়ের মন্দিরে তাঁর মূর্তির বায়ুকোণে লৌহ পেটিকায় রাখা হোলো দুই খণ্ড পাষাণময় পদাঙ্গুলীকে।

এই কার্যের পুরস্কারস্বরূপ হরো বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ বিঘা বাস্তুজমি উপহার পেলেন—শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে।

মীমাংসায় ঠিক হোলো নিত্যপূজার জন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত হবেন। সেবাইতের কোন পক্ষই নিভৃতে গোপনে মায়ের কোন কিছু স্পর্শ করবেন না। এ কারণে দুজন সৎ-ব্রাহ্মণ-সন্তান মায়ের মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গবাস ইত্যাদি পাহারায় নিযুক্ত হবেন।

দৈনিক দক্ষিণা ধার্য্য করে হরেকৃষ্ণ ভট্টাচায্য নামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হলেন নিত্যপূজার জন্য—দু'পক্ষের সুপারিশে। মায়ের মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গবাশ এবং মন্দিরস্থ মুল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার দায়িত্ব দিলেন বিশ্বস্ত সৎ-ব্রাহ্মণ শম্ভুনাথ ও দুলাল ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর। মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করা এবং তাঁর বেশ-বিন্যাসের দায়িত্ব ন্যস্ত হোলো তাঁদের উপর। কোন সেবাইতই তাঁদের বিনা অনুমতিতে মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করবেন না ঠিক হোলো। সেবাইতের তত্ত্বাবধানে এঁরাই মন্দিরের দরজা খোলেন এবং বন্ধ করেন। মায়ের অঙ্গবেশ, তাকে ফুলের মালা পরানো, কপালে সিঁদুর লেপন করা তাঁদেরই একমাত্র অধিকার। এ-পদের সম্মানিত উপাধি হোলো 'মিশ্র'। মায়ের মন্দিরের আশে পাশে বাস্তুভিটে দিয়ে বসবাসের সুবিধে করে দিলেন তাঁদের—দুই পক্ষের সেবাইতরা।

তাঁদের বংশ ধরেরা আজও সেই প্রথা চালিয়ে আসছেন।

॥ পঞ্চত্রিংশ ॥

ইতিহাসের পাতায় ঘুন ধরেছে। গত দিনের ঐতিহ্য জীর্ণ হয়ে গেছে—ছিঁড়ে কুটে একাকার হয়ে গেছে সব কিছু। যাঁরা সেটুকু জোড়াতালি দিয়ে বজায় রেখেছিলেন তারাও চলে গেছেন বহুদূরে। সেদিনের ইতিহাস বিস্মৃতিপ্রায়—সুরু হয়েছে নতুন ইতিহাস, বেচা কেনার ইতিহাস।

সর্বেশ্বর হালদার নেই—আছেন সতীনাথ। তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া মাতৃ-সেবার পালা চালান কোন রকম। আজকাল তারও ব্যাঘাৎ ঘটেছে। প্রথম প্রথম তিনি সব কিছু তদারক করে পিতার মত ত্রুটি-শূন্যভাবে মাসের সেবা-পালা চালাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু আজকাল আর পারেন না। তাকেই চালাতে অন্য লোকের দরকার হয়!

শুঁড়ীর দোকানের লোকজনেরা বাড়ী নিয়ে আসে সতীনাথকে। জয়ীর মা দরজা খুলে বসে থাকে—এই-এলো এই-এলো করে।

নেশার ঝোঁক কাটিয়ে উঠে সতীনাথ ডাকে জয়ীর মাকে, বলে—"একটু কিছু খেতে দেবে গা? বেজায় খিদে পেয়েছে।" জলভরা চোখে জয়ীর মা চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে—কী আছে তার? কি দেবে ক্ষুধার মুখে! তার পর ডাকে জয়ীকে—"যা ত' মা, তোর সেজকাকীমার বাড়ী। চার আনা পয়সা ধার চেয়ে নিয়ে আয় আমার নাম করে। আর কিছু বলিস্ না যেন। হুঁসিয়ার করে দেয় জয়ীকে।

চার আনা কেন? চার টাকা দিতেও কুণ্ঠিত হয় না সেজকাকীমা। সেজকাকার প্রতিনিধি তিনি। পয়সা ক'টা হাতে দেবার সময় শুনিয়ে দেন, আগের দেনাটার কথা। ঋণের মোটা অঙ্কটা নতুন করে শুনিয়ে দেন জয়ীকে।

কড়াক্রান্তি হিসাব করে সুদে আসলে ঋণের টাকা মিটিয়ে দেয় সতীনাথ—তার—জ্যাঠ্‌তুতো ভাই কালীশঙ্করকে। লিখে দেয় পালার অংশ। পালার পুরো অংশ লিখিয়ে নেয় কালীশঙ্কর সতীনাথের হাত দিয়ে।

সই-সাবুদ করে ঋণের টাকা শোধ করে বাকী টাকা গুন্‌তে গুন্‌তে হো হো করে হেসে উঠে সতীনাথ।

জয়ীর মা প্রশ্ন করে, হাসছ কেন ?

হাসব না? আমাকে সিকি মূল্য দিয়ে পালার পুরো অংশ লিখিয়ে নিলো কালীশঙ্কর। আমি মাতাল হতে পারি, তা'বলে জোচ্চর নই, আর বোকাও নই। কালীশঙ্কর ভাবলে আমি মাতাল মানুষ, মদের টানে বহুমূল্য সম্পত্তি জলের দামে বেচে দেব। চামারটা পাঁচশো টাকা দিয়ে দুহাজার টাকা আয়ের পালাটা লিখিয়ে নিলো বটে—তা'বলে এ মাতালটাকে এক বোতল মদ দিতে কার্পণ্য করে নি।

বিকট আওয়াজ করে হাসতে থাকে সতীনাথ। হাসি থামিয়ে বলে—"তা নিক, ভাই'ত বটে—জ্যাঠার ছেলে সে ত' আর পর নয়! আজ যদি আমার নিজের ভাই থাকত তাকে দেখতে হোতো না? বেচারা চালিয়ে উঠতে পারে না। কতগুলো কাচ্চা বাচ্চা, পেয়াদা পাইক আছে কতগুলো মাইনে করা। পারে না বলেই ত' দু'টো পয়সা লাভের আশায় পালা কেনে।"

জয়ীর মা কেঁদে-কেটে সতীনাথের পায়ের উপর মাথা কোটে। "তোমার কাচ্চাবাচ্চাগুলোর কথা চিন্তা করেছ একবার?"

"অনেক করেছি'। ভেবে চিন্তেই'ত সেই চিন্তামণির কাছে জিম্মা করে দিয়েচি তাদের। যার কেউ নেউ তার মা আছে বলে, হাত দু'খানা যুক্ত করে কপালে ছোঁয়ায় সতীনাথ।

কালীশঙ্কর মায়ের বাড়ীর পালা কেনাবেচা করে দু'পয়সা আয় করে। কেনা বেচার নাম ব্যবসা। কালীশঙ্কর মাকে কেন্দ্র করে

ব্যবসা করে। মায়ের সেবার পালা বিক্রী হয় বেপারীদের কাছে। মাতৃ-সেবা-পালার বাজার দর আছে তিথি নক্ষত্র দেখে, সে দর ওঠানামা করে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে হোমরা চোমরা ব্যক্তিরা যখন আসতেন কালীঘাটে মাকে পুজো দিতে তখন তাঁরা অনেকেই খরচ করতেন দু'দশ হাজার টাকা।

সে যুগ গত হয়েছে, সে যুগের মানুষ আর নেই—আছেন মা। তিনিই সব দেখছেন ত্রিনয়ন দিয়ে। কালীশঙ্করকেও দেখছেন, আবার সতীনাথকেও দেখছেন।

আজকাল মায়ের পুজোয় ভোগের ব্যয়-বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। যিনি পালা চালাবেন তাঁকেই সেদিনের মাতৃ সেবার বরাদ্দ-খরচ চালাতে হবে। পালা চালিয়ে যা পাবেন অর্থাৎ যাত্রী সাধারণ মাকে যাকিছু উৎসর্গ করবেন তার সব কিছুই পাবেন পালাদার।

কালীশঙ্কর মায়ের সেবা চালাবার বরাদ্দ-খরচ ধরে দিলেন সরকার বাবুর হাতে! পুরোহিত দক্ষিণা একটাকা, নতুন লালপাড় শাড়ী একখানা, পাঁচসের চালের নৈবেদ্য, কিছু ফল-ফলারী, ভাল সরুচাল দশ সের মায়ের ভোগের জন্য। কাঙ্গালী ভোজনের জন্য আধমণ চাল। নিরামিষ ভোগের আনাজ তরকারী মিষ্টান্ন ইত্যাদির বাবদ পুরোপুরি টাকার হিসাব করে দিলেন তিনি। রাত্রে মায়ের আরতি আর শেতল ভোগের বাবদ আরো গোটা কতক টাকা।

তা'ছাড়া শ্যামরায়ের ভোগ, নকুলেশ্বরের পুজো এবং মন্দির ভাণ্ডারের নির্দ্দিষ্ট জমার টাকা হিসাব করে দিলেন। মন্দির ভাণ্ডারের টাকা অবশ্য সকলকেই দিতে হয়। এই ভাণ্ডার মন্দির রক্ষার যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করে।

যা ব্যয় আয় তার দশগুণ। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে বিশ পঁচিশগুণও হয়ে থাকে কখনও সখনও। আবার কখনও মায়ের সেবার খরচ আয় হয় না মন্দির থেকে।

পাঁচ সের চালের নৈবেদ্য একখানা নতুন শাড়ী কিছু ফল ফলারী আর একটি টাকা পেলেন মায়ের নিত্য পুজার পুরোহিত। সেবাইতের অধীনে যারা কাজকর্ম্ম চালিয়ে—"দিন, মায়ের প্রণামী দিন, যার যা মানসিক আছে মায়ের হাতে দিন"—বলে, যারা সারাদিন চীৎকার ক'রে গলা ফাটালো তারা পেলো দু'এক টাকা করে। অনাথ-আতুর, খঞ্জ-ভঞ্জ শ'দেড়েক ভিখারী ভাগাভাগি করে খেল আধমণ বরাদ্দ কাঙালী ভোজনের মোটাচালের ভাত, ডা'লের জল আর ডাঁটা চচ্চড়ি—

পালাদার সেবা করল মায়ের। মায়ের আসল ভোগ চলে গেল সেবাইতের বাড়ী। সে ভোগ বেচেও দু'দশটাকা পেলেন সেবাইত মশাই।

সন্ধ্যার পর কাছারীতে এসে বসেছেন কালীশঙ্কর। একগাল পান খেয়ে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে ভূড়ুক ভূড়ুক তামাক টানছেন ফরাসের উপর আধসোয়া হয়ে। যেন জমিদার বাবু বসেছেন কাছারীতে প্রজা বেষ্টিত হয়ে।

সরকার বাবু আয় ব্যয়ের খাতা খুল্‌লেন—শোনালেন সেদিনের মায়ের মন্দিরের আয়ের হিসাব। মায়ের প্রণামী বাবদ দু'শো দশ টাকা আট আনা। পূজোর শাড়ী চব্বিশখানা; মায়ের হাতে নগদ আটান্ন টাকা; দ্বার দক্ষিণা একশো বারো টাকা চোদ্দ আনা; বলির মাশুল ছিয়াত্তর টাকা ছ'আনা।* মায়ের হাতে সোনার চুড়ি আটগাছি; ওজন আটভরি, নাকের নথ দুটি, বারো আনা করে দেড়ভরি।

ভোগের ঘরে আতপ চাল দু'মন পাঠিয়েছেন, বড়বাজারের চুনীলাল মিশ্র। কাঁচা আনাজ তরকারী এসেছে রাসমণি স্টেট্ থেকে।

মুখ খুললেন কালীশঙ্কর—চক্ষু মুদ্রিত রেখেই প্রশ্ন করলেন, চালের বস্তা কি করেছ?

আজ্ঞে, সব কিছুই গিন্নীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

---

* বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের কথা।

"সরকার মশাই।"

"আজ্ঞে"-

বলির মাশুলটায় এত গণ্ডগোল হোলো কি করে? বলির হিসাব পাচ্ছি তিন'শো ছয়টি পাঁঠা, আর দুটি মোষ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"চার আনা হিসাবে তিনশ ছয়টির মাশুল ছিয়াত্তর টাকা আট আনা কি বল?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একটাকা হিসাবে দুটি মোষের মাশুল কত?

"আজ্ঞে দু' টাকা"। বিনয় সুরে বললেন সরকার বাবু।

এইবার চোখ খুল্‌লেন কালীশঙ্কর, সোজা হয়ে উঠে বসলেন তিনি। দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌লেন, হিসেবে এত গরমিল কেন?

পাশে বসেছিল জগবন্ধু পাণ্ডা আফিঙের নেশায় বুঁদ্ হয়ে, বলির মাশুল আদায় করে সে, কত্তামশায়ের কণ্ঠের ঝাঁজে তার নেশা কেটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সে-ই উত্তর দিল। "আজ্ঞে বাবু তাই হবে"।

"কেন?"

"কেন হবে না বাবু? দু'শো পচানব্বুইটি ছাগ বলির মাশুল, সাধারণ যাত্রীর কাছ থেকে তিয়াত্তর টাকা বারো আনা আর এগারোটি ছাগ বলির মাশুল সিপাইদের কাছ থেকে দু'আনা হিসাবে এক টাকা ছ'আনা।

"আর বাকীগুলো?" প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর হালদার মশাই। আজ্ঞে বলছি আমাদের সরকার বাবুর একটি ছাগ বলি, সেটির মাশুল ছাড়বাদ গেছে। খাতার উপর থেকে মুখ তুললেন সরকার মশাই। কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে হালদার মশাইয়ের কৃপাদৃষ্টি পাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

কালীশঙ্করের ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠলো, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার?

হাসিখুসী মুখ করে বল্‌লেন সরকার মশাই, খোকার মামা-বাড়ীর থেকে দলবলসহ এসে পড়ল সবাই, তাই খোকার মা বলেছিল একটু মাংসের ব্যবস্থা···

চমৎকার। আর সেই জন্যই বিনামাশুলেই একটা নিরীহ ছাগশিশুর গলা ভরে দিলেন হাঁড়ি কাঠে—তারপর? মুখ-ঘোরালেন হালদার মশাই।

একটি বলির মাশুল একটাকা হিসাবে···

একটি কেন? ঝাঁজালো কণ্ঠে বলে উঠলেন কালীশঙ্কর।

আজ্ঞে সেই কথাই বলছি—আমাদের ছোটঠাকুরবাবু এসেছিলেন যজমান সঙ্গে নিয়ে। তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে বলি দেওয়ালেন।

এইবার গর্জ্জে উঠলেন কালীশঙ্কর হালদার মশাই—"তাই বুঝি দাতাকর্ণ জগবন্ধু পাণ্ডা বলির মাশুলটা ছেড়ে দিয়ে সতীনাথকে দয়া দেখালেন?

আজ্ঞে না। তিনিই বল্‌লেন, আজকের পালাটা আমারই। মাটির দরে কালীশঙ্করকে বেচে দিয়েছি। এই সামান্য মাশুলের উপর আর লোভ করিস্ না জগু। জগবন্ধু পাণ্ডার কথা চাপা পড়ে গেল কালীশঙ্করের তর্জ্জন গর্জ্জনে। "সে শয়তানটা আমার কাছ থেকে দাম নেয় নি? আগাম নগদ টাকা দিয়েছি সেই বেইমানটাকে। যে দিনের যে দর তাই নিয়েছে সে। পঞ্চমীর পালা তাতে সোমবার, কে ওকে অত টাকা দর দিত? নগদ টাকা আগাম গুণে দিয়েছি—সেটা তার বাপের ভাগ্যি"···সদর দরজার দিকে নজর ঘুরতেই কালীশঙ্কর হালদার শশব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন। গড়গড়ার নলটাকে সরিয়ে রাখলেন পাশে। দু পা' অগ্রসর হলেন সদরের দিকে।

মুনসেফ্ বাবু এসেছেন। দেওয়ানী কোর্টের মুনসেফ্ গৌরীকান্ত শর্ম্মা। কালীশঙ্করের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন তিনি। কালীবাড়ীর কালীমায়ের প্রসাদ পেতে এসেছেন মুনসেফ্ বাবু।

প্রসাদ পাওয়ার সাথে আরো পাওনা পেলেন তিনি। সাদর

অব্যর্থনায়, আদর আপ্যায়নে হালদার মশাই চরম করে দিলেন। মায়ের বাড়ী পাওয়া একখানি গরদের চাদর উপহার দিয়ে বললেন কালীশঙ্কর মশাই,—আমাকে জিতিয়ে দিতে হবে মুনসেফ্ বাবু। বিধবার সম্পত্তি আমার হাতে যদি না আসে, তবে অপরের হাতে চলে যাবে নিশ্চয়ই। দু'দুটি বছর ধরে আমি বিধবার ভরণ-পোষণ চালিয়ে আসছি—আজ যদি······হঠাৎ কান খাড়া করলেন তিনি। "কে ডাকে অমন করে ?" ডাকৃতে ডাকৃতে অন্দর মহলে চলে এসেছে লোকটি। ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার গর্জ্জে উঠলেন হালদার মশাই। "বার করে দাও ওকে বাড়ী থেকে।"

একটি শিশু কোলে করে কাঁদছে এক কাঙ্গালিনী মা—ক্ষুধায় কাতর হয়ে। বল্‌ছে, একটু ভোগ খেতে দাও গো রাজাবাবু।

"তাড়িয়ে দে মেয়েটাকে"—বল্‌লেন কালীশঙ্কর হালদার। তখনও বিনিয়ে বিনিয়ে টেনে টেনে সুর করে বলছে কাঙ্গালিনী—চাট্টি খেতে দেবে গো রাজাবাবু—?

না দেব না। "চলে যা এখান থেকে"—আবার বললেন হালদার মশাই।

চলে গেল কাঙ্গালিনী-মা চোখের জল ফেলে—কালীশঙ্কর হালদারের বাড়ী থেকে।

॥ ছত্রিশ ॥

এমনি করে চলে গেছেন ভাগ্য দেবী প্রতাপাদিত্যর ভাগ্যাকাশ থেকে। কালীক্ষেত্র আদিতে ছিল তাঁরই রাজ্যাধীনে। মায়ের প্রিয় সন্তান ছিল প্রতাপ। মা স্বয়ং যেমন যেচে এসেছিলেন প্রতাপের ঘরে, তেমন চলে গেলেন রাগে আর দুঃখে চোখের জল ফেলে।

তাঁর প্রিয় প্রতাপকে মাথায় পাগ্‌ড়ী বেধে রাজা বানালেন, রাজত্ব দিলেন, ধারালো অসি দিলেন আত্মরক্ষার জন্য। রাজ কার্য্যে মন্ত্রণা দেবার জন্য তিনি স্বয়ং মন্ত্রী সেজে বসলেন রাজ মন্দিরে।

এক পুরুষ পূর্ব্ব থেকেই গৌড়রাজ্যের সকল সম্পত্তি, মা এনে গচ্ছিত রেখেছিলেন যশোর রাজ্যে—প্রতাপকে করেছিলেন যশের অধিকারী। তিনি নিজে সাজলেন রাজমাতা যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণী। মায়ে-বেটায় কিন্তু একটা সর্ত্ত হয়েছিল গোপনে গোপনে। মা বলেছিলেন,—"আমি এলাম নিজের ইচ্ছায় কিন্তু চলে যাব প্রতাপের ইচ্ছায়। ও যেদিন বলবে "যাও" সেদিন আমি চলে যাব।"

প্রতাপ রাজা হয়ে বসেছেন, কত তার ধন-দৌলৎ। দান খয়রাতে মুক্ত হস্ত হয়েছেন তিনি। একবার তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন। অর্থাৎ এই ব্রতর দিনে রাজা আর রাজমহিষী বসবেন সিংহাসনে দানের ভাণ্ডার নিয়ে। সেই সময় যিনি যা প্রার্থনা করবেন তিনি তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। হয়েছিলও তাই—সেদিন তিনি সকলের প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে।

সবই মায়ের খেলা। তিনি প্রতাপকে নিয়ে খেললেন কিছুদিন। তাঁর হাতে 'রাস্' আল্‌গা করে দিয়ে বললেন—"দেখি প্রতাপ কি করে"।

কি আর্ করবে ?

প্রতাপের বাসনা তার মত যশের ভাগ্য আর যেন কারো না থাকে।

বাক্‌লার রাজা রামচন্দ্রের খুব নাম ডাক—সমাজপতি তিনি।

তাঁর যশমান ভূসম্পত্তি করায়ত্ব করবার বাসনা জাগল প্রতাপের মনে। তাই নিজের কন্যা বিন্দুমতির বিবাহ দিলেন রাজা রামচন্দ্রের সাথে—কৌশলে তাঁকে হত্যা করবেন বলে। বিয়ের রাত্রেই তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র চললো পুরোদমে। কিন্তু বিফল মনোরথ হলেন তিনি।

ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে পালিয়ে গেলেন রামচন্দ্র, তাঁর আপন রাজত্বে বাকলায়—ত্যাগ করে গেলেন স্ত্রী বিন্দুমতিকে। রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবাহিতা কন্যা তার দাম্ভিক বাপের কাছে পড়ে রইল—।

প্রতাপের মনোক্ষোভ তার ভেতরেই গজরাতে লাগল। মনে ভাবলেন পিতৃব্যই আমার মনোক্ষোভের মূল কারণ। তিনি আমার ভাগ্যর প্রতি ঈর্ষা করেন—তিনিই আমার উন্নতি অগ্রগতির মূলগত বাধা।

প্রতাপ একদিন অতর্কিতে নিরস্ত্র পিতৃব্যের মুণ্ডটা তলোয়ারের এক কোপে নামিয়ে দিলেন দেহ হতে।

মা তখনই রুষ্ট হলেন মনে মনে—কয়েক ফোটা চোখের জলও ফেলেছিলেন মন্দিরে বসে। যে প্রতাপাদিত্যকে পিতৃসহোদর রাজা বসন্ত রায় আপন সন্তানের মত স্নেহ মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন,—সেই পুত্র তুল্য প্রতাপ নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল তাঁকে।

মা নীরব রইলেন। মনের দুঃখ চেপে রেখে বসে রইলেন মন্দির মাঝে। একদিন এক কাঙ্গালিনীকে মা পাঠালেন প্রতাপের কাছে—করুণ স্বরে কিছু ভিক্ষা চাইল কাঙ্গালিনী—আমায় কিছু ভিক্ষা দাওগো রাজাবাবু"—

প্রতাপের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে গর্জে উঠল।—"কে বিরক্ত করে অসময়ে?"—তারপর আদেশ করলেন—সাজা স্বরূপ রমণীর স্তনদ্বয় কেটে ছেড়ে দাও। ওকে বুঝিয়ে দাও অসময়ে রাজা প্রতাপাদিত্যকে বিরক্ত করার কি ফল!

কল্পতরু প্রতাপের মতিগতি বদলে গেছে। সে যে মায়ের কৃপা হতে বঞ্চিত হয়েছে। তাইত' তার কণ্ঠে মাতৃ-কৃপা-বঞ্চিত স্বর রুক্ষ

হয়ে দেখা দিয়েছে। মাতৃ কৃপায় যে বঞ্চিত তার এমন দশাই হয়। তার সকল সুষমাটুকু চলে যায় মাতৃকৃপা বঞ্চিত হবার সাথে সাথে।

মা ভাবছেন প্রতাপকে ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু যাবেন কি করে? অঙ্গীকার করেছেন না তিনি? প্রতাপ তাকে যেদিন যেতে বল্‌বেন সেই দিনই তিনি চলে যাবেন রাজ্য ছেড়ে। মা কৌশল করে প্রতাপের মুখ দিয়ে 'যাও' কথা আদায় করে নিলেন। যশোরেশ্বর সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যশোরেশ্বরী মা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। মন্দির মাঝে দক্ষিণমুখী মাতৃমূর্তি ঘুরে উত্তরমুখী হয়ে গেল।

মা বললেন, যা তোকে দিয়েছিলাম তা' আবার কেড়ে নেব। নবাব বাদশা জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে হটিয়ে দিয়েছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত করে। আবার তাকে ডেকে আনব। সে যে আমার কথা শোনে, আমায় পূজো করে, ভয় করে।

দ্বিতীয়বার মানসিংহ যুদ্ধে নামলেন, প্রতাপকে দমন করতে। এই সময় মানসিংহের গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী প্রতাপের রাজকার্য্যের এক কর্ম্মচারী ছিলেন।

সমরে নামলেন দুই বীর। একদিকে মোঘল বাদশাহ আর একদিকে বাংলার স্বাধীনতা-কামী বাঙ্গালীবীর। মানসিংহ এবার এলেন আরো বেশী সৈন্য নিয়ে। রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র কচুরায় এবং গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্ত মানসিংহকে সাহায্য করল নানাভাবে গোপন সন্ধান দিয়ে।

প্রতাপাদিত্য পরাজিত হলেন—বন্দী হলেন রাজা মানসিংহের হাতে। খাঁচায় বন্দী করে তালাচাবি বন্ধ করে বন্দী বীরকে পাঠানো হোলো দিল্লীশ্বরের কাছে।

যেন জঙ্গলের স্বাধীন দুর্দ্দান্ত পশুরাজ খাঁচায় বন্দী হোলো। কিন্তু খাঁচাবন্দী বীর রাজধানীতে পোঁছবার আগেই কাশীধামে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

যশোরেশ্বরী মা চলে গেছেন যশোহর রাজ্য ছেড়ে। প্রতাপও চলে গেছে। প্রতাপ মহিষী আত্মহত্যা করেছেন যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে। রাজ্যেশ্বরী গেছেন, রাজা গেছেন, রাজ্যের সব কিছু চলে গেছে ধীরে ধীরে।

গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী ছিলেন প্রতাপাদিত্যের রাজকর্ম্মচারী; তাঁকে নিয়ে চললেন রাজা মানসিংহ। জাহাঙ্গীরের দরবারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করে দিলেন তাঁকে।

গুরুদেব শুনলেন সকল কথা। শুনে খুসী হলেন—বললেন, —"সবই মায়ের ইচ্ছা। যাঁর চরণে তোকে সঁপে দিয়েছিলাম তিনিই তোর ব্যবস্থা করলেন।"

ফার্সীভাষায় যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত, রাজকার্য্য বুঝতেন ভালভাবেই। জ্ঞান বুদ্ধির গভীরতা ছিল সাগরের মত। মোঘল দরবারে তাঁর জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পেলেন সম্রাট স্বয়ং, তিনি খুসী হলেন। উপাধি দানে মর্যাদা বাড়ালেন তাঁর। মজুমদার উপাধীতে ভূষিত হলেন তিনি।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের পুত্র গৌরহরি মজুমদার তাঁর পৈতৃক বাসস্থানে বাস করে, বাদশাহ-প্রদত্ত পিতৃসম্পত্তি আয়ত্বে আনতে পারলেন না কিছুতেই। মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর প্রভৃতি পরগণাগুলোর কাজকর্ম্ম এবং শাসনের সুবিধার জন্য পৈতৃকভিটে ছেড়ে চলে এলেন—দমদমের কাছে বিরাটিতে। বিরাটিতে বসে পরগণাগুলো আয়ত্বে আনাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত মজুমদার পিতার কাছ থেকে শিখ্‌লেন রাজকার্য্য, শাসন আর প্রজাপালন পদ্ধতি। জমিদারী রক্ষার অনেক কিছুই শিখলেন পিতার কাছ থেকে। অগোছাল পরগণাগুলো ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিলেন তিনি। পরগণা তার শাসনে এলো।

নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ তখন বাংলার সুবেদার। সতেরোশ' বারো সালে সুবে বাংলাকে তেরোটি চাকলায় এবং বহু পরগণায় ভাগ করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য—রাজকার্য্য আর রাজকর আদায়ের সুবিধা।

শ্রীমন্ত মজুমদারের পুত্র কেশব মজুমদার দক্ষিণ চাক্‌লার রাজস্ব আদায়ের কার্যভার পেলেন,—সুবেদারের কাছ থেকে। মোঘল নবাব নতুন উপাধি দান করলেন, তাঁর কাজকর্ম্ম আর কর্ম্মকুশলতা দেখে। 'মজুমদার' সরে গেল, এলো 'রায়চৌধুরী'। কেশব রায়চৌধুরী হলেন শ্রীমন্ত মজুমদারের পুত্র।

এদেশে তখন ইংরেজের আনাগোনা সুরু হয়েছে। মাথা নত করে এসে দাঁড়ায় তারা বদশাহের দরবারে। মনে-মুখে কথা কয় বাদশাহের সাথে, তারপর কুর্ণিশ করে চলে যায়। তাদের প্রার্থনা, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই—সাত সাগর পেরিয়ে এসেছে সোনার দেশে একটু ঠাঁই পাবার আশায়।

ওদিকে তখন ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজিম-অসমানের বাংলা শাসন চলেছে। তিনি ইংরেজের কাছে বেচলেন তিনটি গ্রাম—কলিকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর। মাত্র ষোল হাজার টাকায় বেচলেন গ্রাম তিনটিকে। ইংরেজ কোম্পানী অবশ্য এর জন্য বার্ষিক খাজনা দেবে নবাব সরকারকে।

ইংরেজের কাছে বেচা গ্রাম তিনটি যে কেশব রায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, সনদে একথা স্পষ্টকরে লেখা আছে।

কি সাংঘাতিক! বাংলার সুবেদার মুর্শীদকুলী খাঁর গোপন ইস্তাহার চলে গেল চাক্‌লায় চাক্‌লায়—এ পরগণা থেকে ও পরগণার শেষ মাথায়। সকলকে হুঁসিয়ার করে দিলেন তিনি—"খবরদার ইংরেজের কাছে এক ছটাকও জমি বেচ না কেউ।"

ইংরেজ বড় স্বেচ্ছাচারিতা সুরু করেছে—যা ইচ্ছে তাই করছে তারা। থাব্‌লা মারছে এখানে ওখানে।

বিরাটিতে বসে কেশব রায়চৌধুরী বড় চিন্তিত হলেন। এখানে বসে ত' জমিদারী রক্ষা করা যাবে না, ইংরেজরা কি করতে কি করে বসবে? অনেক ভেবে চিন্তে তিনি বিরাটির বাস তুলে দিয়ে চলে এলেন কালীঘাটের দেড়ক্রোশ দক্ষিণে বড়িশা বহুলায় অর্থাৎ বর্শে বেহালাতে। জমিদারীর কাছারী হোলো কলিকাতায়। বর্ত্তমান লালদীঘির কাছে।

কালীঘাট অঞ্চলটা তখন সম্পূর্ণ জঙ্গলে ঢাকা। বাঘ ভল্লুক, সাপ-কোপের আস্তানা। মায়ের মন্দির ছিল জঙ্গলের মাঝেই—মন্দিরের আশেপাশে ঘর কয়েক হাঁড়ি-বাগ্দীর আর সাধু-সন্ন্যাসীর বাস ছিল তখন। মায়ের মন্দিরকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনযাত্রা সুরু।

পিতার অবর্ত্তমানে সম্পত্তির তত্ত্বধানের ভার পড়ল পুত্র সন্তোষ রায় চৌধুরীর উপর। দয়া-দাক্ষিণ্যে, শাসনে-পালনে তিনিও কেশব রায়চৌধুরীর মত সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলেন। যেমন বাপ তেমন বেটা।

সন্তোষ রায়চৌধুরীর আসল নাম শিবদেব। তিনি প্রজাবৃন্দের বহু সন্তোষের কারণ হয়ে সন্তোষ নামে পরিচিত হয়েছেন। ইনি ছিলেন শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত। একদিন জমিদারীর কাছারী থেকে ফিরছেন বেহালায় নিজ আবাসে। আসছেন আদি-গঙ্গা বেয়ে বজরা চেপে। সন্ধ্যা উতরে গেছে, আট দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী বজ্‌রা চলেছে ছলাৎ ছলাৎ করে। সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। এমন সময় শুনতে পেলেন মিষ্টমধুর ঐকতান ভেসে আসছে জঙ্গলের মাঝ হতে। কান খাড়া করলেন তিনি—কিসের আওয়াজ? জঙ্গলের মাঝে আছে মায়ের মন্দির। সন্ধ্যা আরতি হচ্ছে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে। মায়ের আরতি করছে সন্ন্যাসীরা।

বজরা বাঁধার হুকুম দিলেন সন্তোষ রায়চৌধুরী। বজরা বাঁধা হোলো মায়ের ঘাটে। তিনি নামলেন ধীরে ধীরে, এগিয়ে গেলেন মায়ের

মন্দিরের কাছে—কৃতার্থ হলেন মাতৃদর্শন করে। মন তাঁর আনন্দে ভরে গেল। তাঁরই জমিদারীতে মায়ের অবির্ভাব। তাঁর পূর্ব পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলীর জন্ম এই স্থানেই, এখানেই তাঁর বাল্য জীবন কেটেছে মায়ের চরণ তলে। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক কথা জানতে পারলেন তিনি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে এলেন সন্তোষ রায়চৌধুরী। বাড়ী ফিরে মায়ের পূজো পাঠালেন কালীবাড়িতে। নিত্য পুজার ব্যবস্থা করলেন তিনি। বহুকাল যাবৎ বেহালায় সাবর্ণগোত্রীয় সন্তোষ রায়-চৌধুরীর তরফ থেকে মায়ের পূজো আসত। সর্ব্বাগ্রে তাঁদের পূজো হোতো, তারপর অন্য সকলের—এমনই নিয়ম ছিল সেকালে।

কালীবাড়ীর বর্ত্তমান মায়ের সুদৃশ্য বৃহৎ মন্দির তিনিই গড়লেন জীবনের শেষ দিকে। আটকাঠা জমির উপর মন্দির গড়া হোলো সেকালের তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে। সময় লাগল আট বছর। মন্দিরের সম্পূর্ণ অবস্থা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রামলাল রায় চৌধুরী এবং ভ্রাতুস্পুত্র রাজীব লোচন দুজনে একত্রে আঠার'শ নয় সালে এই মন্দির সম্পূর্ণ করেন।

মায়ের বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুতের প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে হুজুরীমল্ল নামক এক পাঞ্জাবী সৈনিক মা কালীর ঘাট প্রস্তুত করেন। তিনি ছিলেন বণিক উমিচাঁদের শ্যালক। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজকে যথেষ্ট সাহায্য করার দরুণ সেকালের গভর্নর ভেলরেষ্ট সাহেব তাকে পুরস্কার দিতে চাইলেন,—"বলহে বাপু, কি পুরস্কার চাও তুমি?"

আজ্ঞে, পুরস্কার যদি দিতেই হয় তবে, আমাকে কালীঘাটের আশে-পাশে বারোবিঘা জমি পুরস্কার দিন। ঐ জমিতে মায়ের জন্য স্নানের ঘাট আর ধর্ম্মশালা গড়ব।

—"কিন্তু তা'হবে কি করে?"

কালীঘাট যে দেবোত্তর সম্পত্তি। চিন্তা করলেন, তৎকালীন গভর্নর ভেলরেষ্ট সাহেব। তারপর সেই দেবোত্তর সম্পত্তির ভেতর

থেকে বারো বিঘা ভূমি বার করে নিয়ে হুজুরীমল্লকে দান করলেন এবং নিজেদের খাস দখল থেকে সাহা-মুদি নগরে বারোবিঘা জমি দেবোত্তর করে দিলেন।

পাঁচশত পাঁচানব্বুই বিঘা কয়েক ছটাক জমি মা কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি। এই জমির খাজনা ইত্যাদি কোন কিছুই দিতে হয় না। না সরকার বাহাদুরকে, না জমিদারকে। হুজুরীমল্লর বারোবিঘা জমি আলিপুরের কালেক্‌টরের অধিন।

দানে পাওয়া জমিতে পুণ্য কার্য করলে বোধ হয় পুণ্য সঞ্চয় হবে না ভেবে, হুজরী মল্ল নিজ ব্যয়ে মা কালীর ঘাট চাঁদনী আর শিবমন্দির গড়ে দিলেন।

মানসিংহ যে বার মায়ের মন্দির গড়লেন, তার শতাধিক বৎসর পর মুর্শীদাবাদের জনৈক কানুন গো কালী মায়ের মন্দির-পাশে শ্যামরায়ের মন্দির প্রথম নির্ম্মাণ করেন। ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী তাঁর পৈতৃক শিলা-শালগ্রাম ইত্যাদি পঞ্চদেবতা সহ শ্যাম রায়ের লক্ষ্মীসহ শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। সে দিনের সেই মন্দিরের পরিবর্ত্তন হয়েছে। শ্যামরায়ের বর্ত্তমান মন্দির গড়েছেন বাওয়ালীর জমিদারের পূর্ব্ব পুরুষ উদয় নারায়ণ মণ্ডল। সে প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। আঠারো'শ তেতাল্লিশ সালে তৈরী হোলো এ মন্দির।

মায়ের মন্দির প্রস্তুত হবার বছর তুই পরে মন্দির-তোরণ-দ্বার এবং মায়ের ভোগের তুটি ঘর নির্ম্মাণ করলেন, গোরক্ষপুর নিবাসী টিকা রায়। আঠার'শ বারো সালে—

মায়ের মন্দির হোলো, শ্যামরায়ের মন্দির হোলো, তাঁর দোল মঞ্চ হবে না?

হবে বৈ কি! আঠারো'শ আটান্ন সালে শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ তৈরী হোলো। এই দোল মঞ্চে শ্যামসুন্দরের যুগল মূর্তি এনে বসানো হোতো—তাঁকে ঘিরে চলত' দোল উৎসব। আবির আর কুম্‌কুমে

রাঙ্গা হয়ে যেত মন্দির চত্বর। এই দোলমঞ্চ তৈরী করলেন জোড়া-সাঁকোর রামচন্দ্র পাল।

এমন যে-কালীবাড়ী, যেখানে এত লোকের সমাগম, এত আনন্দ-কোলাহল, সেখানে মায়ের নহবৎখানা হবে না? হবে না কে বলল? শ্যামরায়ের মন্দির তৈরী হবার বিশ বছর পূর্বেই তা' তৈরী হয়েছে। গড়েছেন—আন্দুলের কাশীনাথ রায়। অনুমানিক আঠারোশ'-পঁয়তিরিশ সাল। সকাল-সন্ধ্যায় মায়ের পূজো আর আরতির সময় নহবৎ বাজে এখানে।

শ্যামরায়ের মন্দির যেবার গড়া হয় সেই বার কালীঘাটে এসে-ছিলেন শ্রীপুরের জমিদার তারক নাথ রায় চৌধুরী। তিনি গড়েছিলেন আর একটি ভোগের ঘর। এইটি হোলো মায়ের তৃতীয় ভোগের ঘর। তেলেনীপাড়ার জমিদার কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছে ছিল তিনি মায়ের পূজো দেবেন এবং সেই পূজোর ভোগ রন্ধন হবে তার নিজের তৈরী ভোগের ঘরে। মা বললেন—"তাই হবে, তুমিও একটা ভোগের ঘর করে দাও।' চতুর্থ ভোগের ঘর তৈরী হোলো। এরও প্রায় বছর তিরিশেক পর মায়ের অবশিষ্ট ভোগের ঘরগুলি গড়লেন সাহানগরের মদন কোলে এবং ছাপরার গোবর্দ্ধন দাস আগ্রওয়াল।

দেশের বহু লোক মায়ের বাড়ীর বহুকাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করলেন। মা যে তাই চান। সন্তানের দেওয়া উপহারে মায়ের যে আনন্দের সীমা থাকে না। যেমন তাঁর অঙ্গের গয়না এলো বহু সন্তানের কাছ থেকে তেমন মায়ের বাড়ী তৈরী হোলো বহু সন্তানের বহু কিছু একত্রিত করে।

মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করবার সুবিধার্থে তার চারিপার্শে রাস্তা বাঁধিয়ে দিলেন গোড়িয়া নিবাসী গোবিন্দ চন্দ্র সাধুখাঁ।

মন্দির থেকে মা কালীর ঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াতের পথ গ'ড়ে দিলেন আঠারোশ' উনসত্তর সালে—জোড়াসাঁকোর রামচন্দ্র পাল এবং গোবর্দ্ধন দাস আগ্রওয়াল। মায়ের মন্দির পিছনে সুবরালা যেখানে বসেছিল সন্তান রক্ষার জন্য আত্মগোপন করে, সেখানে আছে প্রাচীন

মনসা গাছ। সেই গাছের গোড়া বাঁধিয়ে দিলেন বেহালার নস্করপুরের গোবিন্দ মণ্ডল। আঠারোশ' আশী সালে সে গাছের গোড়া বাঁধালেন তিনি। আজও সে গাছ জীবিত আছে।

এ কাহিনী শুধু বউমাই শুন্‌লেন না। বউমার মত নিবিষ্টচিত্তে শুনেছিল আরো তিনটে প্রাণী ; ব্রজগোপাল, আশিস আর তার ইংরেজ বন্ধু জন্‌ পিটার।

সাগর পারের শেতাঙ্গ বন্ধুকে সাথে করে এনেছিল আশিস রাজতীর্থ কালীঘাট দেখাতে,—হিন্দুধর্ম্মের মহাপীঠস্থান কালীক্ষেত্রের দক্ষিণা-কালীর জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দেখাতে। বিদেশী বন্ধুর বহু জিজ্ঞাসা, বহুপ্রশ্নের নিস্পত্তি হয়েছিল সেদিন।

মহা আনন্দে এ কাহিনী শুনিয়েছিলেম তাঁদের। বউমার মনটাও আনন্দে ভরেছিল কানায় কানায়। আশিস নাকি সেদিন সকালে বাজার থেকে গোপনে একটা পৈতে কিনে এনে গলায় দিয়ে, চেলীর কাপড় পরে খাঁটী হিন্দু-ব্রাহ্মণ সেজে মায়ের বাড়ী গিয়েছিল জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে দর্শন করতে। ইংরেজ বন্ধুকে হিন্দু ব্রাহ্মণত্ব দেখাতে এত অভিনয়, এত সাজগোজের ঘটা করতে হয়েছিল তাকে। বউমা তাতেই খুসী। বলেন, এতেই তার মতিগতি বদলাবে, সৎকাজের ভঙ্গীও ভাল—মরা মরা করেই রাম রাম হবে।

॥ আটত্রিশ ॥

জন পিটার আশিসের কর্ম্মস্থলের বন্ধু। সেখানেই তাদের পরিচয়। প্রথম পরিচয়েই গভীর ভাব—ভাব তার বাঙ্গালীর সাথে, বাংলার সাথে। বাংলাদেশের বহু গল্প শুনেছে সে, ঘুরেছে বহু স্থান, দেখেছে অনেক কিছু। আশিসের সাথে কলকাতা কেন্দ্রে বদলি হয়ে এসেছে জন পিটার।

সে বাংলাকে ভাল করে জানতে চায়—ভালকরে বুঝতে চায় বাংলার সংস্কৃতি। তাঁর পিতা অলিভার পিটার বাংলায় কবিতা লিখতে পারতেন। সংস্কৃত বুঝতে পারতেন অল্প কিছু। উইলিয়ম কেরীর বাংলা ব্যাকরণ তার বাংলা শিক্ষার উৎস জুগিয়েছে, কিন্তু জনের উৎস জুগিয়েছে বাংলার আবহাওয়া।

জনের মামা চিরকাল বাংলাদেশে কাটিয়ে মরণ সময় গেলেন নিজের দেশে। তিনি সংস্কৃত শ্লোক পড়তেন, গীতাপাঠ করতেন, পান খেতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সখ্ হয়েছিল হিন্দু ব্রাহ্মণদের মত তিনিও গলায় পৈতে নেবেন। কিন্তু লজ্জায় নিতে পারেন নি।

তার মেম সাহেবই বা কম কিসে? বিয়ের পর তিনিও কিছু বাংলা শিখেছেন তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে। বানান করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পারেন তিনি।

সেই মেমসাহেবও এসেছেন স্বামীর সাথে কালীঘাটে কালীদর্শন করতে। তাঁর আনন্দ কত? জীবনে এই প্রথমবার দর্শন করলেন বিশ্ববিখ্যাত পীঠস্থান কালীঘাট।

মায়ের সুদৃশ্য অত্যুচ্চ মন্দির আর নাট মন্দির দেখে খুসী হলেন জনের পত্নী। ঘুরে ঘুরে দেখলেন তাঁরা কালীবাড়ীর আনাচে কানাচে। যত দেখেন তত প্রশ্ন করেন বিদেশী দম্পতি। শ্যামসুন্দরের অপরূপ

মূর্তি দেখে শ্রীমতী পিটার বললেন—"ভগবান কৃষ্ণ আর রাধিকার বহু গল্প আমার জানা আছে, রীয়্যালি এদের প্রেমের তুলনা হয় না"। কিন্তু মিষ্টার মুখার্জ্জী এই প্রেমের ঠাকুরের মন্দিরটা তত সুন্দর নয় কেন ?—মন্দির বলে মনেই হয় না।

—কি রকম মন্দির দেখবার আশা করেছিলেন মিসেস্ পিটার? প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে তিনি বললেন, বর্ত্তমান মন্দির থেকে অনেক ভাল কিছু—গডেস্ কালীজ্ মন্দিরের মত 'গর্জিয়াস' মন্দির হোলেই ঠিক মানানসই হোতো।

বুঝলাম বিদেশী কন্যার মনোগত বাসনা। কি বলতে চান তিনি। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম—"দেখুন, সে যুগের দাতা যখন এ-মন্দির গঠন করেছিলেন; তখন হয় তাঁর এই রকম 'গর্জিয়াস্ কিছু করবার ইচ্ছা ছিল না, না হয়, তাঁর সঙ্গতি ছিল না। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, পর্ণ মন্দিরে শ্যাম সুন্দরকে রোদ্-জলের ভেজা থেকে রক্ষা করবার জন্য একটা কিছু তাড়াতাড়ি গড়বেন। যদি কখন কোন ভক্ত দাতা এসে এমন কিছু গঠন করবার প্রস্তাব করেন, তবে হয়ত, হালদার মশাইরা সে প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন।'

শ্রীমতী এবং শ্রীমান পিটার হাঁসলেন আমার কথা শুনে। পিটার বললেন—এস্থানের সব কিছুই জাতীয় সম্পত্তি কি বলুন ?

"কেন" ?

"কেন নয় ? জনসাধারণের দানের উপর যখন কালীবাড়ীর বহু কিছু নির্ভর করে, তখন সে-সম্পত্তি জনসাধারণের নয় কি ?—বললেন, জন পিটার।

শিলা নারায়ণ ইত্যাদি পঞ্চদেবতা, হালদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর গৃহদেবতা ছিলেন। সেই দেব মন্দির অন্ততঃ হালদার মশাইদের নিজস্ব ব্যয়ে সুদৃশ্য করে নির্ম্মাণ করা উচিত ছিল। এই কথাই বোঝাতে চান পিটার দম্পতি। পিটার বললেন—এই

কালীবাড়ীর এবং বহু সম্পত্তির যাঁরা মালিক, সেই হালদার মশাইদের কোন কীর্ত্তি দেখলাম না কালীঘাটে—বড়ই দুঃখের কথা। কালীমন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, গেট্, পথ, ভোগের ঘর ইত্যাদি বহু কিছুই তৈরী হয়েছে বাইরের দাতাদের কাছ থেকে ; হালদার মশাইদের তরফ থেকে নয়।

যেন উপসত্ব ভোগের জন্য বসে আছেন বিলাসপ্রিয় জমিদার ! এঁদের আয় ব্যয় সমান থাকে। কীর্ত্তিও রেখে যান এঁরা। মরচে-ধরা পোকায় কাটা জরাজীর্ণ এক কীর্ত্তি। যা দেখলে মানুষের বুক দুঃখে ভরে উঠে। সেই দুঃখই ঘোচাতে মা বসে আছেন। মা কলুষ নাশিনী—সন্তানের কলুষতা দূর করার চিন্তাতেই তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন দিবানিশি।

পিটার বললেন সেই কথাই। তিনি বললেন—"কালীঘাট যেমন তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তেমন ব্যবসার দিক দিয়েও এ স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা উচিত।" কত শত পরিবার বেঁচে আছে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে। অহোরাত্র তারা পরিশ্রম করছে দুটো পয়সা পাবার আশায়। কখনও জিনিস বেচে, কখনও দালালী করে, মন্ত্র পড়ে পয়সা উপায় করে কেউ—কেউবা উপায় করে মন্ত্র পড়ার ভান করে। বুদ্ধি থাকলে পয়সা উপায়ের বহুমুখী পথ খোলা আছে এখানে। বুদ্ধি না থাকলে ঠকার ভয় পদে পদে।

ইংরেজ ছেলেটি অনেক কথা কইত আশিসের সাথে। কথায় কথায় বলে তাকে—তোমাদের প্রাচীন গ্রন্থ 'বেদ' আমি জেনেছি। তাতে আছে বহু দেব-দেবীর স্তুতি, মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞের কথা, শাসন-অনুশাসন অনেক কিছু। ধর্ম্মের সে-সব ক্রিয়া-কলাপ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—এখানে এসেও অনেক কিছুই দেখ্‌লাম। সত্যকথা বল্‌তে কি, এসব আমার খুবই ভাল লাগে।

"আমার মোটেই ভাল লাগেনা। আমি এসব কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"—দম্ভের সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল আশিষ।

"নিজের ধর্ম্মের প্রতি এত উদাসীন তুমি? কেন বিশ্বাস কর না"—তীব্র জিজ্ঞাসা ইংরেজ ছেলেটির। বহু তর্ক-বিতর্ক চলল পৃথক ধর্ম্মী দুই বন্ধুর মধ্যে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে গেল, পরাস্ত হতে চায় না কেউ। মেম্ সাহেব সে তর্কের ফাঁস কাটিয়ে চলে এসেছেন বউমার কাছে।

মতের পর মত, যুক্তির পর যুক্তি দেখিয়ে কাটাকাটি চলেছে দুই পক্ষের। দুই গিন্নী চেয়ে আছেন দু'জনের দিকে। মেমসাহেব কামনা করছেন তাঁর স্বামী জয়ী হোক। আর বউমা প্রার্থনা করছেন—"মাগো, আমার স্বামীর সুমতি দাও, স্বধর্ম্মে তার মতি হোক, সে ঈশ্বর বিশ্বাস করুক—সাহেবকে জয়ী কর মাগো"।

ঈশ্বরাশক্তির সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ভাবটুকু কঠিন আবরণে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল আশিস। সে আবরণ খুলে দিয়েছে জন পিটার। বউমা তাতেই খুসী হয়েছেন। তাঁর স্বামী নাস্তিক নয়, বিধর্ম্মী নয়, কঠিন আবরণের নরম মানুষ সে! পরম আনন্দে মায়ের পূজো পাঠালেন বউমা। স্বামীর হাত দিয়ে পূজো পাঠালেন তিনি। মায়ের চরণে দাঁড়িয়ে রইল আশিস—মাতৃ দর্শনে মোহিত হোলো সে।

মা যে জাদু জানেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকারী তিনি। জাদু তাঁর স্পর্শে, তাঁর দর্শনে জাদু, জাদু মাখা তাঁর ঐ অমৃত নামে। ও নাম উচ্চারণ করেই জীব মোহিত হয়ে পড়ে।

ম; ময়েতেই যে সব। প্রাণ, আপান, সমান, উদান, ব্যান, দেহের পঞ্চবায়ুকেই স্মরণ করা হয় এক ম উচ্চারণে—ওম্‌-য়েতেই যে ম'য়ের সব কিছু। যে এক ম'য়ে এত কিছু, সেই ম'য়ে আকার যুক্ত করে ডাকতে হয় তাঁকে—তাইত মা' নামে এত জাদু, এত মধু। জীব মোহিত হয় মাতৃনামে।

॥ উনচল্লিশ ॥

জন পিটার খুসীমনে বিদায় নিলেন সেদিন। হাত জোড় করে বাংলা কায়দায় নমস্কার করলেন শ্রীমতী পিটার। বল্লেন, খুব আনন্দে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে গেলাম এখানে। যা দেখলাম, যা শুনলাম তা মনে থাকবে বহুকাল। দুঃখ পেলাম মায়ের সম্মুখে সন্তান বলি দেওয়া দেখে। জানি না আপনাদের শাস্ত্রে এ বিষয়ে কি মীমাংসা। তবে মানুষের দুঃখ পাবার পক্ষে এ-দৃশ্যই যথেষ্ট। চোখের সাম্‌নে এরকম বিষাদ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। ছাগ শিশু যখন মা মা করে চীৎকার করে—সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত। আমি দেখেছি ছাগের মুণ্ডটা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবার পরও মা মা করে ডেকেছে—সে ডাকের আওয়াজ আমাদের কানে না পৌঁছলেও বিশ্বজননীর কানে পৌঁছে যায় সে আওয়াজ।" কথা বলতে গিয়ে চোখদুটি ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল শ্রীমতী পিটারের।

ছাগ শিশুর পা-গুলি মুচড়ে দুমড়ে পিঠমোড়া করে হাঁড়িকাঠের মধ্যে যখন তার মাথাটা ভরে দেয়, তখন সে মা মা করে আর্তনাদ করে উঠে। জীবন ভিক্ষা চেয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে মায়ের কাছে। 'মা রক্ষা কর রক্ষা কর' বলে, অন্তিম ক্রন্দন করে ছাগশিশু।

এমনি এক ছাগশিশুর ক্রন্দন শুনে আমার মাতামহীও কেঁদেছিলেন তেমনি করে। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলেন তিনি কালীবাড়ী থেকে। ব্রজর বয়স তখন বছর দুয়েক হবে, সবে মা বুলি বেরিয়েছে তার মুখ দিয়ে, দু'চার পা হাঁটতে পারে। তাকেই বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন দিদিমা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—"এই শিশুর সঙ্গে সেই শিশুর কি তফাৎ থাকতে পারে? ভয় পেয়ে সব শিশুই যে অভয় চায় মায়ের কাছে। আঘাতের যন্ত্রণা যে উভয়েরই সমান।

বউমাকে কাছে ডেকে বল্‌লেন,—নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনা

করে অপর সন্তানের অমঙ্গল কোরো না কখনও—এতে কিছুতেই মঙ্গল হতে পারে না।

সেইদিন রাত্রে তিনি মায়ের নাম জপ করলেন যথা রীতিভাবে, সন্ধ্যাহ্নিকের পর জলযোগ সেরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন। ভোরের দিকে কাছে ডাকলেন আমাকে। বল্‌লেন,—"আজ আমি চলে যাব।"

"চলে যাবে! কোথায় চলে যাবে? কি বলছ এসব?" ঠিকই বলছি ভাই। কাল রাত্রে ঝগড়া করেছি মায়ের সাথে। "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে দিদিমা" বলে, চলে যাচ্ছিলাম, তিনি হাত ধরে টান দিলেন। "আমার হাড়কখানা গঙ্গায় দিবিত ভাই? এই লোভেই কিন্তু এসেছিলাম কালীঘাটে। আর'ত সময় নেই, যোগাড় কর সব—সবাইকে খবর দে।

মুখে কথাগুলো স্বীকার না করলেও মন আমার সব কথাগুলোই বুঝেছিল। বৃদ্ধের এই কথাগুলো বৃদ্ধরাই বুঝতে পারে। দিদিমা বল্‌লেন,—তোকে বল্‌লাম চুপি চুপি, বাড়ীময় জানাজানি করিস না যেন।

তাই চুপ করে রইলাম—মনটা আমার মুস্‌ড়ে গেল। বসে আছি, আমার সন্ধ্যাহ্নিকের যোগাড় কর'ছেন বউমা। ওদিকে দিদিমাও যথারীতি প্রাতঃকালীন কাজকর্ম্ম সেরে আহ্নিক সারতে বসেছেন। এমন সময় দাদামশাই এসে হাজির হলেন—যশোহর জেলা থেকে। একজন গোমস্তাকে সাথে করে এনেছেন তিনি পৌষকালী দর্শন করতে। যে কথাটা আমি সব থেকে বেশী চিন্তা করেছিলাম, সেইটাই মিটল তত বেশী সহজে। ভেবেছিলাম ব্রজকে পাঠিয়ে দেব যশোহরে। দিদিমার অন্তিম সময়, অতি বৃদ্ধ দাদামশাইকে সাথে করে সেই আনতে পারবে। কিন্তু ব্রজকে পাঠাতে হোলো না,—তিনিই এলেন। চুঁচুড়া থেকে মহেশ গাঙ্গুলী এলেন কন্যা প্রতিভাকে সাথে করে, বিহারী মুখুয্যে, সুরেশ চাটুয্যে, প্রিয়লাল, সনৎ, যতীন আত্মীয় স্বজন সকলেই এসে হাজির হলেন স্ত্রীপুত্র নিয়ে কালীদর্শন করতে। আত্মীয় স্বজনে বাড়ী

ভরে গেল। দিদিমা যা চেয়েছিলেন তাই হোলো—কোন এক অদৃশ্য শক্তি টেনে আনল সবাইকে। সকলের অলক্ষ্যে যেন তাঁরই ইঙ্গিতে সব কিছু ব্যবস্থা হোলো।

সবাই এসেছেন, সকলের একত্র সমাবেশ দেখে বৃদ্ধা মাতামহী আনন্দ পেলেন। সুরেশের বড় কন্যা সুজাতাকে কাছে ডেকে আদর করলেন। নব পরিণীতা সনতের স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করলেন, বললেন, তোমরা সবাই এলে, একটু আনন্দ কর। আমি আরাম করে বিছানায় শুয়ে তোমাদের কথা শুনি। আমাকে ঘিরে বোসো তোমরা। বউমা কোথায় গেল? ··আশিস কোথায়?···ব্রজকে ডাক। ক্ষণকাল নীরব রইলেন তিনি; সঙ্গে সঙ্গে সকলে নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করলেন দিদিমা। ডাকলেন—'শিবু ও শিবু'। সেই পরিচিত চিরমধুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো তাঁর কণ্ঠে। আমায় কাছে ডেকে বললেন, "আমায় চণ্ডী শোনাত ভাই, বউমাকে বলো গীতাখানা শিয়রে রাখুক",—বলেই তিনি চুপ করলেন।

সবাই বুঝলেন—বেশী করে বুঝলেন দাদামশাই, বুঝতে পেরেই তিনি সরে গেলেন পাশের ঘরে।

সকলকে কাছে ডেকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছেন দিদিমা, তাঁর কথা জড়িয়ে গেছে, কানে শুনছেন ব্রহ্মনাম। হঠাৎ তাঁর চোখ ছুটো ঘুরে গেল দরজার দিকে। হাত ইসারা করে ডাকলেন—"আয় ভেতরে আয়।" লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরা একজন সধবা স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালেন ঘরের ভেতর। ত্বরিতপদে এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন—"আমি সবিতা।" চোখ ছুটো নড়ে চড়ে উঠলো দিদিমার। আরো খানিক এগিয়ে এসে সবিতা তাঁর কানের কাছে মুখটাকে আরো ঝুঁকিয়ে বল্‌ল—"কাশী থেকে আসছি আমি বড় ছেলের সাথে—কালীঘাটে এসে খোঁজ করে করে আপনাকে দেখতে এলাম দিদিমা।" চিন্‌তে পেরেছেন আমাকে?

তাঁর চোখ ছুটি বোধহয় একবার নড়ে উঠে সবিতার কথায় সায়

দিয়েছিলেন। আর চেয়ে থাকতে পারলেন না! তিনি ধীরে ধীরে চোখ বুজলেন। নিশ্চিন্তে পরম শান্তিতে নিদ্রিত হলেন মাতামহী—মহানিদ্রার কোলে আশ্রয় পেলেন তিনি।

সবিতা কেঁদে উঠলো—"দিদিমা কথা কও, শুধু একটিবার বল, তুমি আমায় চিনতে পেরেছ—।"

বউমা কাঁদতে পারলেন না, চোখ দুটি লাল করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর সিঁদুর আর আলতা দিয়ে তাঁকে সাজালেন মনের সাধ মিটিয়ে, শেষবারের মত। পাড়াপড়শী ভেঙ্গে পড়লো সতীর মহাপ্রয়াণ দেখতে। মাতামহী এসেছিলেন রাজতীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করতে। সে-সঞ্চয় নিয়ে তিনি চলে গেলেন। সঞ্চয়ের মহাকেন্দ্রভূমি এই কালীঘাট; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয় এখানে।

মাঝে মাঝে সেদিনের সেই দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে। আমি যেন শুনতে পাই তাঁর কণ্ঠস্বর—চোখ-বুজলে তাঁর সদাহাস্য মুখখানি আমার অন্তর্নয়নে ধরা পড়ে। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনীর কাছে কামনা করেছি,—করুণা প্রার্থনা করেছি তাঁর শ্রীচরণে। তাঁর অনন্তরূপ কল্পনা করেছি, দর্শন পাইনি কখনও। চোখ বুজলে যাঁকে দর্শন করি তাঁকেই স্মরণ করি ব্রহ্মময়ীরূপে, তাকেই প্রনাম করি—

"সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

'অমৃত মন্থন' কার্য্যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে আমি যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেছি—তাঁদের কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করি।

—গ্রন্থকার

যে সকল গ্রন্থ-রসে 'অমৃত মন্থন'
পুষ্টি-লাভ করেছে—

প্রতাপাদিত্য চরিত—রামরাম বসু
প্রতাপাদিত্য—নিখিলনাথ রায়
প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত—সত্যচরণ শাস্ত্রী
মুর্শীদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়
কলিকাতা একালের ও সেকালের
—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়—হরিহর শেঠ
পুরাতনী—হরিহর শেঠ
পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ
কলিকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্
—রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জীবনচরিত
—বিপিন বিহারী মিত্র
কালীঘাট ইতিবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কালী কৈবল্য দায়িনী—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
ক্ষিতীষ বংশাবলী চরিতম্ (অনুবাদ)
—শশিভূষণ নন্দী
শ্রীমন্ত সওদাগর—ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়
কেতদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল'
—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)
মনসামঙ্গল—বিজয় গুপ্ত
সংবাদ পত্রের সেকালের কথা
—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
Rivers in Gangetic Delta
—Adams William
Kalighat and Calcutta—G. D. Bysack

সহায়ক গ্রন্থ

চৈতন্য ভাগবত (অন্ত্যখণ্ড)

কবি কঙ্কন চণ্ডী

চূড়ামণি তন্ত্র

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী

ঘটক কারিকা

কালীক্ষেত্র দীপিকা

সমাচার দর্পণ

যুগান্তর

যাঁদের কাছ থেকে মৌখিক প্রাচীন-কাহিনী শুনে এবং আদেশ ও উপদেশ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি—

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কালীনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুররাজ স্মৃতিতীর্থ

বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (হালদার-গুরুবংশ)

শশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় (মিশ্র)

সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়